দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার

দুঃখিনী বর্ণমালা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক
হীরক রায়
অনন্ত প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
এস. চক্রবর্তী
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
২৬, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ
আশীষ চৌধুরী

মূল্য—[illegible] টাকা

শ্রী পরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"আসে যদি আসুক নেমে
আঁকা বাঁকা আগুন জ্বলা বজ্র শিখা
শিরের পরে।
জাগে যদি জাগুক বায়ে
প্রলয় নাচন
জলে স্থলে প্রবল কাঁপন
বিশ্ব জুড়ে।
ঘনায় যদি নিকষ কালো
সূয্যি ওঠা সাত সকালে
তবু ও পারবেনা, পারবেনাকো
ধরতে মোরে, মারতে মোরে, পিষতে মোরে॥"

—এসকাইলাস

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে—১ম ও ২য় পর্ব

সমুদ্র মানুষ,

একটি জলের রেখা,

পুতুল,

বিদেশীনি

নগ্ন ঈশ্বর

শেষ দৃশ্য

সমুদ্র পাখির কান্না

এক

সে দাঁড়িয়েছিল। ওর ছায়াটা লম্বা হয়ে জলে ভাসছে। ছায়াটা আরও লম্বা হবে। যতক্ষণ না রেল-স্টেশনের পেছনে হাজিদের বড় পাটগুদামের ওপাশে সূর্য অস্ত যাবে ততক্ষণ এই ছায়া ক্রমশঃ লম্বা হবে। ওর মনে হয়, একসময় ছায়াটা এত লম্বা হয়ে যাবে যে সে চার পাশের সব গাছপালার সঙ্গে, ছায়ার সঙ্গে, সাঁতরে নদীর ওপারে চলে যেতে পারবে। পিছনে সেই পাটগুদাম। এবং কিছু কলের চিমনি। আর আশে পাশে সব ছোট-বড় নৌকা। কোষা নৌকা, গয়না নৌকা, গাদাবোট। কিছু ভাঙা নৌকা কিনারে। জল নেমে গেছে বলে যারা জলে নৌকা ডুবিয়ে রেখেছিল, তাদের নৌকা জলের উপর ভেসে উঠেছে। রোদ্দুরে কাঠ ফাটছে।

সে ঠিক জেটির উপর দাঁড়িয়ে নেই। কিছুটা আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে অজস্র খুঁটি। নদীর পাড় ভাঙার জন্য এখানে এই খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে। নদীর ওপারে বন্দর। ওপার থেকেই তিনজন লোক আসবে, চিঠিতে এমন লিখেছে কামাল। নৌকাটা ঘাসি নৌকার মতো দেখতে হবে। ছোট আকারের নৌকার পাটাতনে একটা সবুজ রঙের বাদাম থাকবে। নৌকায় ছই থাকবে। দরমার ছই। কাঁচা বাঁশের চাঁচড়ায় তৈরি। নৌকার তিন নম্বর গুঁড়াতে পাল পুঁতে দেবার ব্যবস্থা থাকবে। দুটো বৈঠা, একটা লগি, গুণ টানার জন্য লাল রঙের দড়ি।

শহর থেকে সব মানুষেরা গ্রামের দিক সরে পড়ছে বলে, হুড়মুড় করে নৌকা ভিড়ছে, লটবহর তুলে নিচ্ছে এবং মেয়েরা শিশুরা সব উঠে গেলে সব নৌকা ওপারে চলে যাচ্ছে। সে একা একটা কাঠের সিঁড়িতে নদীর চরে দাঁড়িয়ে সব মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। দুটো একটা মিল্লে

গেলেও সবটা মিলে যাচ্ছে না। ওর ছায়াটা সেজন্য লম্বা হয়ে যাচ্ছে; এবং পাটগুদামের ওপাশে সূর্য হেলে পড়তেই নদীর ওপরে আর রোদ থাকল না। সব ছায়া—গাছের অথবা পাখির, সব ছায়া—মানুষের অথবা খুঁটির, নিমেষে নদীর জলে হারিয়ে গেল।

সমসের চশমাটা খুলে একবার রুমালে কাঁচ মুছে নিল। ওর যেমন অভ্যাস, চশমাটা নাকে দেবার সময় একটু ঠেলে দেয় এবং কানের দুপাশ থেকে চুল সরিয়ে আলগা ভাবে রেখে দেয়, এখনও তেমনি রাখল। এতটুকু সে উদ্বিগ্ন নয়। দেখলে মনে হয় ওর আত্মীয়-স্বজন আসার কথা স্টীমারে, সেজন্য সে এখানে একা বসে দাঁতে ঘাস-বিচালি চিবুচ্ছে।

এভাবে বসে থাকলে শত্রুপক্ষ তাকে সন্দেহ করতে পারে। পিছনে বড় রাস্তা। ট্রাক-বাসগুলো সে চলে যেতে দেখল। বড় বড় বাড়ি। সব খান সাহেবদের। সে হেলমেটধারী কিছু সৈনিককে বাড়িগুলো পাহারা দিতে দেখে এসেছে। চারপাশে ওর তাকালেই মনে হয়, এবার ওরা কোথায় যেন যাচ্ছে। ওপারের গাছপালার দিকে তাকালেই মনে হয় সে এবং অন্যসব মানুষের ডাক এসেছে—আমাদের বড় মাঠে যেতে হবে। আর দেরি করলে চলবে না। সময় হয়ে গেছে। সে উঠে দাঁড়াল।

সে যতটা ভাবছিল মুখের রেখাতে কোন দুশ্চিন্তার ছাপ রাখবে না, যেন তার মেমান আসার কথা, মেমান আসবে বলে বসে আছে এমন মুখ করে, কিন্তু করে রাখতে পারছে না। ঘাসি নৌকা না এলে সে যে কি করে! এই সময়ে কাঠের বাক্সটা তুলে না দিতে পারলে ওরা রাতারাতি শহর ছেড়ে শীতলক্ষ্যার জলে ভাসতে পারবে না। রাতে রাতে ওদের এটা পঞ্চমীঘাটে পৌঁছে দেবার কথা। সে যে কি করে!

সে একটু জলের কাছে নেমে গেল। কাদামাটি। ডানদিকে শুধু একটা বালির চর। সেখানে কিছু জলজ ঘাসের শুকনো জমি। সে ভাঙা নৌকা, শ্যাওলা ধরা খুঁটি, রোদে পড়া মাঠ-ঘাট ভেঙে চরের

কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর একটা উপুড় করা কোষা নৌকার পেটে পা দিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে সে ওপারের মানুষজন এবং তাদের চলাফেরা দেখার চেষ্টা করছে। জায়গাটাতে পুরনো গাব পচানো জলের গন্ধ। এখানে সারি সারি নৌকা সব উল্টে রাখা হয়েছে। নৌকাগুলোতে বর্ষার আগে গাবের কষ খাওয়াতে হবে। কষ খেলে কাঠ শক্ত থাকে। জলে পচে যায় না। নৌকাগুলোর বয়েস হয়ে গেলে আলকাতরার পলাস্তারা দিতে হয়। অথবা এও হতে পারে, মানুষেরা টের পেয়ে গেছে, এবারে বর্ষায় সব নৌকা ওদের কাছে যুদ্ধ জাহাজ হয়ে যাবে।

ওরা এখন থেকেই গাবের কষ খাওয়াতে শুরু করেছে। গাবের পচা গন্ধ, আলকাতরার গন্ধ, জল নেমে গেছে বলে ঘোলা জলের মাটি-মাটি গন্ধ সমসেরকে ভারি আকুল করে তুলেছে। সে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছিল—স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! সে বিড় বিড় করে স্বাধীনতার গান গাইতে থাকল। ভিতরে ভয় জাগলেই সে গায়—ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। তার তখন ভয় থাকে না। ভিতরে ভিতরে সে এক আশ্চর্য রকমের শক্তি পায়। যেন সে তখন তার মাকে দেখতে পায়, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ডাকছে, সমু বাপ আয়। আর দুষ্টুমি করিস নে। এখনি বৃষ্টি আসবে। বৃষ্টিতে ভিজে গেলে তোর জ্বর হবে সমু।

সমুর কাছে তখন সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। কোন ভয় থাকে না। সে যেন দেখতে পায়, এক মানুষ দূরের মাঠে দাঁড়িয়ে ডাকছে। বলছে, সমু এই তোমার বাংলা দেশ। এস. তুমি আমার সঙ্গে। মাঠ-ঘাট চিনিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। লতাপাতা, ঝোপঝাড় যেখানেই দাঁড়াবে, দেখবে কি সুন্দর এক সজীব খণ্ড খণ্ড ভালবাসা তোমার এই জমির জন্য। সমু, তুমি এই দেশের মানুষ, এই দেশ তোমার। তখন সমুর আর কিছু ভাববার অবকাশ থাকে না। মানুষটা কেবল তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে চৈত্রের এই সন্ধ্যায় আজ বড় বেশি. তা

টের পাচ্ছে। সে যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবতীয় কিছু উৎসর্গ করে দিচ্ছে, সে যে আর নিজের জন্য নয়, সে যে মাটি এবং ভালবাসার জন্য, মাটি বলতে সে বোঝে এই বাংলাদেশ, ভালবাসা বলতে বোঝে জীবনকে উৎসর্গ করা, আজ সে এবং মিনু, ওর বারো বছরের ছেলে এটা টের পেয়ে গেছে।

ঘাসি নৌকাটা এলে সে মিনুকে, আবুলকে নৌকাতে তুলে দেবে। আর সঙ্গে যাবে কাঠের বাক্সটা। কাঠের বাক্সটা ভাঙা জেটির নিচে, সেখানে মানুষজনের যাতায়াত কম। কিছু খড়কুটো দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে কামাল। সঙ্গে একটা মানচিত্র আছে। বাইরে খানেরা দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় কোন পয়েন্টে তাকে হাঁক দিতে হবে, আমি বাংলাদেশের মানুষ—এবং বাংলাদেশের মানুষ বললেই ছেড়ে যেন দেবে তাদের। তারপর নদীর কোন খাঁড়িতে ঢুকে গেলে সে দুপাশে, নাঙ্গলবন্দ, মাঝের চর, অলিপুরা এইসব গ্রাম পাবে। তার কাছে একটা মানচিত্র আঁকা আছে। পঞ্চমীঘাটে যদি কোন কারণে তাদের বাক্সটা নামাতে অসুবিধা হয়, তবে তাদের আরও চার মাইল পথ এগিয়ে যেতে হবে। এবং গ্রামের নাম দন্দি। এখানে ব্রহ্মপুত্রের একটা খাড়ি নদী অদ্ভুত দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। চার পাশে তার গ্রাম, এপারে লাঙ্গুর চর, উত্তরে দন্দি। নদীর পাড়ে শ্মশান। ডানদিকে এক ফসলের জমি। জমি পার হলে ঘন এক বড় অশ্বত্থগাছ। গাছে একটা পতাকা উড়বে। পতাকা উড়লেই টের পাওয়া যাবে, ওরা এসে গেছে। তখন পায়ে হেঁটে অথবা যে-কোন ভাবে ফিরে আসা। ফিরে আসার কোন প্রোগ্রাম নেই! বাংলাদেশের মাঠে-ঘাটে তখন তুমি হিতৈষী মানুষ। তোমাকে তারা ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

সমসের এমন সময় দেখল একটা নাও ওর সেই ভাঙা জেটির দিকে এগিয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি ডিঙিগুলো লাফ দিয়ে পার হয়ে এল। সে নদীর চর থেকে নেমে যাবার মুখে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। হাতে পায়ে ব্যথা লাগতে পারে। সে কিছুই খেয়াল করছে না।

কারণ তাড়াতাড়ি তাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে। এবং অন্ধকার নামার আগে সে কাঠের বাক্সটা তুলে দেবে। আবুল, মিনু স্টেশনের ওপাশে একটা শেডের নিচে অপেক্ষা করছে। যেন ওরা স্টেশনে এসেছে কোথাও যাবে বলে, ট্রেন পাচ্ছে না, কবে যে ট্রেন আসবে তাও কেউ বলতে পারছে না। কি যে হয়ে গেল দেশটা—এমন মুখ করে বসে রয়েছে। তারা যাবে একটা বড় কাজে। এ কাজে যেতে হলে খুব একটা সাহসের দরকার হয় না, মা আর ছেলের চোখ-মুখ দেখলে এমন মনে হয়।

আবুল তুই ভয় পাচ্ছিস না তো? আমরা খুব একটা বড় কাজে যাচ্ছি। তোর বাবাকে কি যে আজ ভালবাসতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আবুল যেন বলছে, মা তুমি দেখো আমি ঠিক পৌঁছে দেব তোমাদের। আমরা এভাবে ঠিক পৌঁছে যাব। বাবা কেন যে আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলছে না! বাবা ভয় পেয়ে গেছে, না মা? বস্তুত মা আর ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। মিনু বোরখার নিচে। আবুল লুঙ্গি পরেছে নীল রঙের। মাথায় সবুজ রঙের টুপি। গায়ে লাল রঙের শার্ট। সে তার মাকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে, মেমান-বাড়ি যাবে। একটা পুঁটলি কিছু সেউই বাঁধা পুঁটলিতে। যেন মিনু তার মা-বাবার জন্য সেউই নিয়ে যাচ্ছে। আর একটা পুঁটলিতে বেঁধে নিয়েছে শুকনো ফুল। তারপর দুটো নতুন কাপড় এবং একটা টিনের বাক্স। বাক্সটাতে মিনুর শাড়ি সায়া সেমিজ। এবং তালপাতার পাখা হাতে। আর ছোট্ট আয়না। আয়নাটা আবার ভাঙা। এখনও দিলীপ অথবা আমিনুল আসছে না। সে বোরখার ভিতর থেকে সন্তর্পণে চারপাশটা দেখছে। একটা শালপাতা উড়ছে স্টেশনে। দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। দশ-বারো জন খান, রাইফেল হাতে স্টেশনটা পাহারা দিচ্ছে। কাছে এলেই মিনু আবুলকে জড়িয়ে ধরে বলছে, এদিকে আয় আবুল। ওরা তোকে দেখছে। তুই আমার কাছে থাকলে আর কোন ভয় থাকে না।

আবুল এমন শুনে নাচতে থাকল, মা, দেব নাকি ভুড়ি ফাঁসিয়ে ?

আবুলকে মিনু জড়িয়ে বলল, না বাবা, এমনি করলে চলবে কেন !

বস্তুত আবুলের কাছে এখন এটা খেলা হয়ে গেছে। সে জানে তারা হয়তো কেউ বাঁচবে না, কিন্তু কেন জানি ভয়-ডর কিছু নেই তার। সে, সে বলতে সব মানুষ এই বাংলাদেশের, ভেবে ফেলেছে এখন শুধু জান দেবার সময়। এই জান দেবার সময়ে শুধু সে হাতের নিচে লুকানো একটা কালো জীবের মুখ খুলে দিলে হাওয়ায় আতসবাজি উড়বে। চৈত্রের ধলায় গাছের পাতার মত খানেদের মাথা উড়ে যাবে। হাত আবুলের বড্ড চুলকাচ্ছিল।

কিন্তু আবুল টের পেল কে যেন তার পিছন থেকে ফিস ফিস করে বলছে, আবুল কালো জীবের মুখ খুলবে না। বড় দামী জীব। তাকে হেলাফেলা করতে নেই। তুমি মনে রাখবে তোমার চেয়ে ওর দাম বেশী। ওকে ঘাঁটাবে না। যখন সময় আসবে, মা বলে দেবে। মা বলে দিলেই তুমি যে ক'টা পার ফেলে দেবে। যদি একটা হয় বাহবা থাকবে না। দুটো হলে বলব, আবুল সমসের মিঞার ছেলে। তিনটা হলে বলব আবুল সমসের আর মিনুর ছেলে। আবুল তখন হাসতে হাসতে বলেছিল, যদি দশটা হয় বাবা? তখন কি বলবে ?

—বলব, তুমি বাংলাদেশের ছেলে। মা জননী তোমার বাংলাদেশ। আবুলের চোখ চিক চিক করে উঠেছিল। সে এখন এই শেডের নিচে দাঁড়িয়ে মায়ের হাত ধরে তা টের পাচ্ছে। এখন শুধু তার বাংলাদেশের মানুষ হয়ে বাঁচতে ইচ্ছা হয়। মাকে তার মাঝে মাঝে কেন জানি বড় অপরিচিত মনে হয়। বাবাকে মাঝে মাঝে খুব দূরের মানুষ মনে হয়, তার প্রিয় এই মাটির ফুল-ফল, নদীর জল, আর মাঠে দাঁড়ালে সে বাংলাদেশের বাতাস বুক ভরে নিতে পারে। বুকের ভিতর তখন মৃত্যু-ভয় থাকে না। তার মা যেন ঘোমটা দেওয়া জননী নয়। তার মা-র হাতে বন্দুকের নল। দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

শেডের নিচে এক দুই করে, কারা আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। এখন শেডের নিচটাতে জাফরি-কাটা হলুদ রঙের ছবি। স্টেশনের কোয়ার্টার গুলোর সার্শি বন্ধ। দরজা-জানালা বন্ধ। যারা পালাবে শহর থেকে, তারা শুধু রাস্তায়। যাদের শহর ছেড়ে যাবার জায়গা নেই, তারা সবাই দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে রয়েছে। মিনু আবুল শহর ছেড়ে গ্রামে পালাচ্ছে এমন একটা মুখ করেও রাখতে পারত। কিন্তু পারছে না, কারণ সব সময় মনের ভিতর আশ্চর্য এক ভালাবাসা তৈরি হচ্ছে। মাটির জন্য ভালবাসা। ওরা সেজন্য কিছুতেই মুখের রেখাতে হাহাকারের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। কি যে এক ব্যাকুলতা এখন ওদের, কখন—কখন আসবে সমসের! ওদের নিয়ে যাবে। নৌকায় তুলে দেবে। জলের ওপর দুলতে দুলতে যাবে তারা। পাটাতনের নিচে কাঠের বাক্সটা। নৌকায় উঠলে মিনু বোরখা খুলে গলুইতে বসে পাহারা দেবে। দিলীপ, আমিনুল, আবুল আর মিনু। এই কাঠের বাক্সটা ওদের সকাল হতে না হতে পৌঁছে দিতে হবে। মিনু স্টেশনে আলো জ্বেলে দিতেই কেমন অধীর হয়ে উঠল। সমসের ওদের সঙ্গে যাচ্ছে না। তার কাজ ঠিকঠাক সব জায়গামতো পৌঁছে দেওয়া। সে এখনও আসছে না। আবুলের হাতে বদনা। যেন তেষ্টা ভীষণ, জল খাচ্ছে তেষ্টা মেটাবার জন্য। আবুলের হাত থেকে বদনা নিয়ে সে ঢক ঢক করে জল খাচ্ছে।

খট খট শব্দ। সে এমন শব্দ পেলেই কেমন ভয়ে গুটিয়ে আসে। সে মুখ দেখলেই খানদের চিনতে পারে। ওদের মুখ পাথরের মতো, চোখ কেবল চক চক করছে। মনে হয় সব সময় বোরখার নিচে কিছু দেখছে গিলে ফেলার জন্য, কেমন তাকাতে তাকাতে চলে যায়।—আবুল, আবুল, তুই কাছে থাক। মিনু আবুলকে জড়িয়ে থাকল।

তখন জ্যোৎস্না নদীর পাড়ে। আলো জ্বলছে না। ওকারা তার কেটে এ অঞ্চল অন্ধকার করে রেখেছে। মেরামত করে গেলে কে যে আবার তার কেটে অন্ধকার করে দিয়ে যায়! সমসের একটা

সিগারেট খাচ্ছিল। জ্যোৎস্না রাত বলে ওর চশমার ভিতর সিগারেটের আগুনটা জ্বলছে। সে এখন নৌকার পর নৌকা লাফিয়ে পার হচ্ছে। কার নৌকা? গোপালদির চৌধুরীসাহেবের। কার নৌকা—ফাউসার গয়না। কার নৌকা—রূপগঞ্জ থানার। তাদের নৌকাটা কোথায়!

—অ মিঞা, কই যাবেন? সমসের চোখ তুলে দেখল, দিলীপ বেশ সেজে বসে রয়েছে।

—নৌকা এখানে রেখেছিস কেন?

—কোনখানে রাখমু কন?

—এদিকে নিয়ে আয় নৌকা। যেন সমসের কেরায়া নৌকা ঠিক করে রেখেছিল, জায়গামতো না থাকায় বিরক্ত হচ্ছে! সে এবার ফিস ফিস করে বলল, এত দেরি কেন?

—খুব খারাপ খবর।

সমসের বলল, কিছু খবর খারাপ থাকবে। তার জন্য বসে থাকলে চলে।

—থাকে না মিঞা! সে এবার নৌকা থেকে লাফিয়ে নামল। জলে নামায় কিছুটা জল নাকে-মুখে এসে উঠেছে। সে নৌকাটাকে টানতে টানতে সেই জেটির নিচে নিয়ে যাচ্ছিল। দিলীপের পরনে লুঙ্গি। সে, কথা আছে হাল ধরবে। সে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়েছে। খোপ কাটা লুঙ্গি পরেছে। মুখে ওর ক্লান্তির ছাপ। সে গত রাতে মেঘনার পারে-পারে যে সব গ্রাম আছে, যেমন বৈদ্যের বাজার, উদ্ধবগঞ্জ এবং দামোদরদিতে কিছু কাঠের বাক্স নামিয়ে এসেছে। ওরা চারজন ছিল। ঠিক মত ওরা পৌঁছে দিতে পেরেছে, কিন্তু ফেরার পথে মকবুল, নলিনী, রহমান তিনজনই গেছে। নদীর জলে ওদের ডুবে যেতে দেখেছে। সে যে কি করে বেঁচে এল, এখন ঠিক বলতে পারবে না। আর বলার সময়ও নেই। এই সব উৎসর্গীকৃত প্রাণের জন্য ওরা নদীর পারে দাঁড়াল। ওরা ওদের

ধর্মমতে যে যার মতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। মাটির জন্য মায়ের জন্য ওরা প্রাণ দিয়েছে। সমসের চুপচাপ। কামালের কথা মত এক ফ্যামিলি ইউনিটের সঙ্গে পাঠাচ্ছে শেষ কাঠের বাক্সটা। সে এটা পাঠিয়ে দিতে পারলেই নিজে আবার অন্য ফ্রন্টে লড়তে পারবে। একটা ঠিকানা রেখে দিয়েছে মিনুর কাছে। ওটা পৌঁছে দিলেই আবার ওদের দেখা হবে। সে আসার আগে আজ মিনুর সামনে প্রথম কথাটা বলতেই মিনু বোধহয় কিছু ভাবছিল।

মিনু রান্নাঘরে ছিল তখন। সে চাল-ডাল সেদ্ধ করে তাড়াতাড়ি কিছু যেমন রোজ রান্না করে দেয় আজও তা দিচ্ছিল। কিন্তু সকাল থেকেই সমসেরকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। সমসের কথা বলছে না। রাতেই সমসের খবর পেয়ে গেছে নদীর পাড়ে চারজনই ডুবেছে। তারপর খবর পেয়েছে না চারজন নয়, তিনজন। দিলীপ ওপারে উঠে যেতে পেরেছে। ওকে গুলি করে মারতে পারেনি। সে ভেবেছিল সব একবার বলবে মিনুকে। সকালের চিঠিটা ওকে আরো বেশি উত্তেজিত করে রেখেছিল। সমসের এমনিতেই কম কথা বলে, আজ সকলে সে তাও বলছিল না। কামালের চিঠি। চিঠিতে লেখা: ওরা টের পেয়ে গেছে সব। জেটির কথাও কিছু হচ্ছে। তোমাকে এ বাক্সটা পাঠিয়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় এবার একটা ফ্যামিলি ইউনিট গড়ে নাও। দেশে বৌ-বিবি নিয়ে পালাচ্ছ, তেমন যেন আমাদের ক্যামোফ্লেজটা হয়। তোমার স্ত্রীকে এবং ছেলেকে এ ব্যাপারে নেবে। ওদের মত চেয়ে নিও। অমতে কিছু করবে না। যদি অসুবিধা থাকে, হাসিনা যাবে। হাসিনা কামালের স্ত্রী। হাসিনা এবং অনি যাবে। দুপুরের ভিতরে তোমাকে সব স্থির করে নিতে হবে।

সমসের জানালায় দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। চিঠিটা সে হাতে রেখেছিল। রান্নাঘর থেকে মিনুর কোন সাড়া-শব্দ আসছে না। সকাল থেকে কারফু শিথিল বলে মানুষজন যে-ভাবে পারছে পালাচ্ছে। শহরের বড় বটগাছটায় বসে কিছু কাক ডাকছে। চারপাশে রুদ্ধ

জীবন ভেঙে পড়েছে। কাক ডাকছিল, আর কোথাও থেকে ঝিঁঝিঁ-পোকার কান্না ভেসে আসছে। সে জানালা বন্ধ করে রেখেছে, কারণ যে-কোন সময় মিলিটারি এসে বন্দুক দেগে চলে যেতে পারে। এবং সারাদিন পচা ভ্যাপ্সা গন্ধ উঠছে। উকিলপাড়ার আশে-পাশে কোর্ট-ময়দানে কিছু লাস পড়ে আছে। দক্ষিণের হাওয়া, গন্ধটা শহরময় ছড়িয়ে দিচ্ছিল। হাতে তার চিঠি। সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। আবুলের মুখ ভেসে উঠছে। আবুলের একবার অসুখ হয়েছিল। খুব ছোট আবুল। সে আর মিনু তখন একটা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করত। সেখান থেকে শহরে আসা যায় না। আবুলের বড় অসুখ। আবুলকে নিয়ে নৌকায় শহরে। দিন-রাত ওদের না-ঘুমিয়ে থাকা, শিয়রে জেগে বসে থাকা, আবুল বাঁচবে না, সমসের দিন-রাত আবুলের জন্য ভেবে ভেবে সারা। মিনু চুপচাপ, সব দুঃসময়েই মিনু চুপচাপ। আবুল ভাল হয়ে গেলে মিনুর চোখে সে এক আশ্চর্য মায়া দেখেছিল। এখন মিনুকে এমন বললে, ওর সেই চোখ দেখতে পাবে। দেখলেই ভিতরটা কেমন কেঁপে ওঠে। সে যে কি করবে, সে কেবল ঘরের ভিতর পায়চারি করছিল। এক রাত লেগে যাবে। সন্ধ্যায় রওনা হলে ওরা ভোর-রাতের দিকে কাঠের বাক্সটা দন্দির বাজারে নামিয়ে দিতে পারবে। হাট-বার হলে অসুবিধা। বোধহয় হাট-বার হবে না। সে দিলীপের কাছে সব জানতে পারবে। নদীর জলে নৌকা, দুপাশে বন অথবা গ্রাম পড়বে এবং মাঠের উপর এখন শুধু রোদ। রাতে গরম থাকবে না তেমন। একটা ঠাণ্ডা বাতাস সব কিছু ঠাণ্ডা করে রাখবে—আর আশে পাশে সড়ক। সড়কে মিলিটারি, সাঁজোয়া গাড়ি। নানা রকমের চেক-পোস্ট। সব নৌকা ওরা সার্চ করতে পারে নাঙ্গলবন্দের ঘাটে। অথবা যা হয়, মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠলে নদীতে, আবুল ভয় পেয়ে যেতে পারে। সে আবুলকে নানা ভাবে এ'কদিন শিখিয়েছে সব কিছু। কারণ সে জানে সে এবং তারা আজ অথবা কাল কোন গঞ্জের সোয়ারি হয়ে যাবে।

সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, মিনু।

কোন সাড়া পায়নি। চাল-ডাল সেদ্ধ করতে করতে মিনু জানালা একটু ফাঁক করে কিছু দেখছিল। সেই মাঠ, বাংলাদেশের মাঠ, সেই বড় বাড়িটা মিশনারি স্কুলের, সেই লালদীঘি এবং দুপাশে সব কেয়ারি করা ফুলের বাগান। আর সেই বড় অশ্বত্থগাছ, গাছ পার হলে নদী, নদীর জল, খেয়াঘাট, এবং নদীতে কলমিলতায় ফুল ফুটল না বুঝি আর! সে মনে মনে বলল, ফুল ফুটবেই। নদীতে জল থাকবে, মাঠে মাঠে ঘাস, ঘুঘুপাখি ডাকবে, আকাশে শরতের মেঘ আর পরবের দিনে ঈদ মুবারক। সে বুঝতে পেরেছিল সমসের ওকে ডাকছে। সমসের কিছু গভীর কথা ওকে শোনাবে। ওর পরামর্শ চাইবে।

খিচুড়িটা ধরে যেতে পারে ভেবে সে নামিয়ে রাখল। হাতা দিয়ে নাড়ল। একটু আদা-হলুদ দিয়ে সে নামিয়ে রেখেছে। গন্ধ উঠছিল বেশ। ক্ষুধার সময় প্রায় জিভে জল চলে আসার মতো! চারপাশে ভয়ংকর অভাব হাঁ করে আছে। যা ঘরে আছে, কোনরকমে মিনু আর চার-পাঁচ দিন একবেলা করে চালিয়ে দিতে পারবে। ওদের এখন থেকেই মেপে মেপে খেতে হচ্ছে। স্কুল-কলেজ বাজার-হাট কতদিন থেকে বন্ধ। মিলিটারির লোকগুলি এসে দোকানপাট জোর করে খুলে রাখতে চেষ্টা করছে। ওরা গত রাতে দোকানপাট খুলতে গিয়ে লুঠতরাজ করেছে। ওরা সঙ্গিনের খোঁচা মারছে। যারাই দোকানপাট খুলতে চাইছে না, তাদের ওরা সঙ্গিনের খোঁচা মেরে হত্যা করছে। এবং গতকালই উকিল পাড়ায় মিশনারি স্কুলের পাশে কয়েকটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে হত্যা করেছে সব মানুষজন। ট্রাকে করে মরা মানুষগুলো নিয়ে যাবার সময় মিনু দেখতে পেয়েছিল, ওদের কারু কারু হাত ঝুলে আছে। এমন একটা দৃশ্য দেখলে আগে হয়তো মিনু রাতের পর রাত বিভীষিকায় না ঘুমিয়ে থাকত। কিন্তু এখন আর কোন কষ্ট হয় না। ওর মা বাবা দুই ভাই এবং বোন কেউ বেঁচে নেই। বাবা হিন্দুস্থানে কাজ করতেন। রিটায়ার করে চলে এসেছিলেন ঢাকায়।

মিনু সেই কবে এসেছিল। দেশ ভাগের সময় সে কত ছোট। সে তার দাদা এবং মামার সঙ্গে এখানে চলে আসে। সমসেরের বাড়ি ছিল বর্ধমান অঞ্চলে। ওরা আসে অনেক পরে। ওরা যখন নিতাইগঞ্জে বাসা নিল, তখন মিনু বালিকা। মিনুর বাবা রহমান সাহেব সবাইকে এ-দেশে পাঠিয়ে, বাকি জীবন সেখানে চাকরি করে চলে আসেন। এসেই তিনি কেমন ভীত হয়ে পড়েন। মিনু সেটা একবার বেড়াতে গিয়ে টের পেয়েছিল। বাবাকে ওরা মেরে না ফেললেও যেন মরে যেতেন। তাঁর ভয় ছিল—কোথায় যেন একটা ভয়, যা তিনি চোখ বুঝলে টের পেতেন। আর কি আশ্চর্য, মিনু এতটুকু আজকাল আর কাঁদে না। চোখ দুটো বড় হয়ে যায়। চুপচাপ বড় বটগাছটার মাথায় কি দেখে। সমসের এসে বলেছিল, নিতাইগঞ্জে কেউ বেঁচে নেই। তোমাদের সবাই গেছে। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল সমসের। তার মুখে কোন শোকের ছবি ছিল না, মিনু কেমন ঠাণ্ডা চোখ-মুখ করে রেখেছিল। ওরা কেউ বেঁচে নেই! ওরা কারা এমন পর্যন্ত সে প্রশ্ন করেনি। ওরা বলতেই সে টের পেয়ে গেছে—ওর বাবা, মা সবাই। কামানের গোলাতে পাড়াটা নিশ্চিহ্ন। কেউ পালাতে পারেনি। চারপাশ ঘিরে ওরা কামান দেগেছে। ওদের কাছে বুঝি খবর ছিল, মুক্তি-ফৌজের বড় একটা দল সেখানে আত্মগোপন করে আছে।

এইসব দেখে দেখে মিনু কি করে যেন ভেবে ফেলেছে, সে, সমসের, আবুল কেউ বাঁচবে না। সমসের যখন ছাত্র নেতা ছিল এবং সমসের যখন বড় নদীতে নৌকায় করে ভেসে যেত, যখন সমসের গাইত—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি—মিনুর ভারি রাগ হত। আমরা বুঝি তোমার কেউ না? সমসের চশমাটা খুলে রুমালে চোখ মুছত। সে চশমা খুলে মিনুর মুখের কাছে মুখ এনে বলত, তুমিই তো আমার সোনার বাংলা মিনু। তুমি, আবুল, [illegible] মাঠ, বন এবং ঘাস, অথবা যা কিছু পাখ-পাখালি—[illegible] আমার এই বাংলাদেশ। বলেই চশমাটা আবার পরত [illegible]। তারপর [illegible] মনে আবার
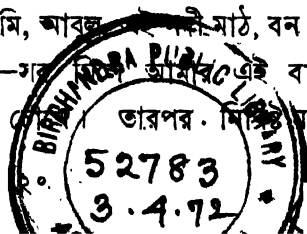
গাইত—ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। নদীর দু'পারে গঞ্জ, গঞ্জের হাট থেকে ইলিশ কিনে নৌকায় রান্না। পালে বাতাস লাগলে সমসের পাটাতনে চুপচাপ শুয়ে থেকে কি যেন তখন আকাশ-পাতাল ভাবত। মিনু বার বার ডেকেও সাড়া পেত না। যেন নদীর অতল জলে সে কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হাজার লক্ষ মানুষ দামামা বাজিয়ে চলে যাচ্ছে বুঝি। বড় নদী, দুপার দেখা যায় না। নদীর জলে সূর্যের আলো আর ঢেউ অজস্র। অজস্র ঢেউয়ের সেই গর্জন শুনলেই সমসের কিসের আওয়াজ শুনতে পেত। যেন কারা দুহাত তুলে বলতে বলতে যাচ্ছে, সে মাঝখানে আছে, সে সবাইকে এক বড় শহরে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের হাতে মশাল। আর ধ্বনি দিচ্ছে। সে কান পাতলে নদীর জলে, আকাশে বাতাসে এবং দুপারে যত গাছপালা আছে সর্বত্র শুনতে পায়—সবাই হাত তুলে দিচ্ছে আকাশের দিকে—গাইছে, সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

সমসের আবার ডাকল, মিনু।

—যাই।

—করছ কি?

—এই আসছি। বলে সে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সমসের কিছু না বলে ওকে চিঠিটা পড়তে দিয়েছিল। কেবল চিঠিটা দেবার সময় বলেছিল, কামাল লিখেছে। তুমি চিঠিটা পড়। পড়ে মতামত দেবে, এক্ষুনি। হাতে আমাদের আর সময় নেই।

এটা যে জরুরী চিঠি, না হলে সমসের এমন বলত না, সমসেরের চোখ-মুখ দেখেই তা টের পেয়েছে মিনু। সে চিঠির ভাঁজ খুলে কিছু পড়তে পারছিল না। জানালা বন্ধ বলে অন্ধকার লাগছিল। সে দরজার কাছে চলে গেল। এবং চিঠিটা খুলে পড়ল। সে একবার পড়ে যেন বুঝতে পারল না। আবার পড়ল। এবং শেষ লাইনটা ওর

ভিতরে কেমন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। যদি ওরা যেতে না পারে, তবে হাসিনা আর অনি যাবে। কত কারণ থাকতে পারে না যাওয়ার, যেন সাধারণ সুবিধা-অসুবিধার কথা লিখেছে কামাল। কোন গুরুত্ব দিয়ে লেখেনি, বড় সহজভাবে লিখেছে। কোন মেলাতে যেতে হবে, এমন একটা ভাব চিঠির ভাষাতে। সে সমসেরের কাছে এগিয়ে গেল। জানালাটা খুলে দিল সামান্য। অস্পষ্ট অন্ধকারে সমসেরের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। আবুল বারান্দার ও-পাশে বুবুর সঙ্গে লুডু খেলছে। স্কুল বন্ধ বলে পড়াশোনা বন্ধ। বাড়ির বাইরে বের হতে পারছে না বলে সারাদিন লুডু খেলে। কি আর করবে, বড় মাঠে বের হতে পারছে না। তবু সে সদর খুলে কতবার এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে আসে। মিনু বকলে, সে চুপচাপ রান্না ঘরের ও-পাশের চালাঘরটার নিচে বসে থাকে। সে পালিয়ে থেকে মাকে ভয় দেখাতে ভালবাসে।

মিনু চারপাশে তাকাল। সমসেরের মুখ দেখার আগে সে দেখে নিল আবুল কোথায়। কারণ মিনু অনেকক্ষণ সোজাসুজি তাকিয়ে ওকে দেখবে, এমন ভেবেছিল। সমসের কেমন ভীত। মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে। সে মিনুর দিকে সোজা তাকাতে পারছিল না।

মিনু বলেছিল, চিঠিটা রাখো।

সমসের কাঠ হয়ে গিয়েছিল যেন, চিঠি সম্পর্কে মিনু কিছু বলছিল না বলে। সমসের চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বলেছিল, তা হলে হাসিনা আর অনি যাচ্ছে ?

—তা যাবে। ওরা যদি যেতে চায় যাবে। আমি বারণ করার কে ?

সমসের বুঝল মিনু কামালের উপর রাগ করেছে। অথবা সমসেরের উপর। সে বলেছিল, তোমাকে তবে চিঠিটা দেখাব কেন ?

—দেখানোর কি দরকার। কামাল কি তবে আমাদের এই বুঝেছে এতদিনে ?

সমসের আর কোন জবাব দিতে পারেনি। মিনু আবুলের অসুখে কি ভেঙে পড়েছিল! সে ভাল করে খেতে পারত না, ঘুমোতে পারত না। চোখে কালি পড়ে গিয়েছিল। অথচ এখন মিনু এতটুকু ভেঙে পড়েনি। ভিতর থেকে এক ভয়ঙ্কর দৃঢ়তা ওকে আশ্চর্যভাবে শক্ত করে রেখেছে।

সমসের দিলীপের কাছে এগিয়ে গেল।—আমিনুল এত দেরি করছে কেন?

—ও চরের উপর দিয়া হাইটা আইতাছে।

—তোর কাছে সিগারেট আছে?

দিলীপ পকেটের ভিতর হাত দিয়ে দেখল, কিছু বিড়ি আছে। সিগারেট নেই। বলল, বিড়ি খাইবি একটা?

—দে, তাই খাই।

—আমিনুল দু-প্যাকেট সিগারেট, এক প্যাকেট বিড়ি আনতে গেছে। তারে আমি কালিবাজারের ও-দিকটায় নামাইয়া দিছি।

—কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

—আরে কতক্ষণ লাগবো। দক্ষিণা বাতাস আছে পালে হাওয়া লাগলে রাইত বারটা বাজতে না বাজতে চইলা যামু।

সমসের বলল, তুই তবে তোর ভাবিকে নিয়ে আয়। ওরা স্টেশনে আছে। গেলেই দেখবি হাতে বদনা নিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর বিবির হাতে তালপাতার পাখা। পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কোড বলবি। আজকের কোড আমাদের 'সজনে ফুল'। 'সজনে ফুল' বললেই ওরা তোর পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করবে।

সে বলল, 'সজনে ফুল'। মুখস্থ করার কায়দায় সে আবার বলল,

সজনে ফুল। তারপর বলল, সজনে ফুলের চচ্চরি খুব খাইতে ভাল। আমার মায় যা রান্না করত না!

সমসের দিলীপের মায়ের হাতের রান্না খেতে খুব ভালবাসত। ওদের পরিবারে রান্নায় কদাচিৎ পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবহার। কেমন নির্মল মনে হত দিলীপের মায়ের হাতে রান্না। বিধবা মানুষ তিনি। কখনও সমসের নিরামিষ ঘরের কাছে যেতে সাহস পায় নি। সে দূর থেকে দাঁড়িয়ে ওর মায়ের রান্না দেখেছে। সব কিছু ধুয়ে পাকলে একেবারে ঝকঝকে পেতলের বাসনে সেই রান্না। সে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে, ওর মা বলত, সমু আইলি? ড্যাফলের টক করছি, ছাখ তো খাইয়া কেমন লাগে। সে আমলকি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে দিলীপ সাদা পাথরে এনে ওকে কিছু খেতে দিলে সমসের নিবিষ্ট মনে খেত। বলত, খুব ভাল হয়েছে মাসিমা। বললেই, নানা রকমের কথা। তর মায়রে কবি তরে য্যান রাইন্ধা দেয়। তারপর সম্বারে কি লাগবে, গুড় কতটুকু লাগে এবং চাটনির মত ওই সুস্বাদু খাবার খেলে যে পেট নিরাময় হয় এমন বললে, সমসের বলত— মাকে বলব মাসিমা।

দুই

দিলীপ লুঙ্গি পরেছে। ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে। থুতনিতে সামান্য দাড়ি। সে মিঞা মানুষ. এবং মাঝি নৌকার। সে দাঁড়ে থাকবে। এখন নদীতে জল কম বলে জায়গায় জায়গায় সে লগি বাইতে পারবে। কোথাও নৌকা চরে আটকে গেলে, সে যখন খুশি ইচ্ছা করলে জলে ঝাঁপ দিয়ে নৌকা ঠেলে নিতে পারে, এমন ভাবে সে লুঙ্গিটা পরেছে। দরকার হলে সে লুঙ্গি খুলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে নেবে।

সে এখন একেবারে বাংলাদেশের বান্দা মানুষ! সে এখন আজ্ঞাবহনকারী। তাব এখন কিছু আর করার নেই। সে জেনে ফেলেছে সন্ধ্যার ভিতর একটা ঘাসি নাও যোগাড় করতে হবে এবং এবার আর স্থলপথে না গিয়ে জলপথে ওকে যেতে হবে। কারণ আর্মির লোকেরা টের পেয়ে গেছে,· বন্দরের ঠিক ওপারে কিছু বাংলাদেশের মানুষ রাইফেল পাচার করতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা বড় রাস্তা ধরে যাবার সময় জেটির ঢালু জমি, নদীর চর, অসংখ্য নাও, গাদাবোট, স্টীমার এবং মোটর লনচের ভিতর স্থির করতে পারছে না কোথায় ঘটনাটা ঘটছে! কাল থেকে ঠিক আছে সমসের আর এ-প্ল্যানটা ব্যবহার করবে না। যখন তখন আক্রমণ ঘটতে পারে। অসংখ্য লোক নদীর ওপারে চলে যাচ্ছে। মেশিনগান দাগিয়ে যে কোন সময় এই সব মানুষ, যারা ওপারে যাচ্ছে, প্রাণভয়ে পালাচ্ছে শহর ছেড়ে, তাদের ফেলে দিতে পারে। ওরা পাখি মারার মত, অথবা মনে হয় বাংলাদেশের মানুষেরা ওদের কাছে মানুষ না, সাধারণ পাখ-পাখালি, ওরা শিকারী বেড়ালের মত সব সময় পাখি ধরার জন্য ওত পেতে আছে।

দিলীপের যেতে যেতে এমন সব মনে হচ্ছিল। ভিড় শহরে নেই। ভিড় যত এই অঞ্চলে। এখান থেকে যারা যে-ভাবে পারছে পালাচ্ছে।

স্টেশনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। মানুষেরা ট্রেনের আশায় বসে রয়েছে। নানা রকমের কাহিনী ফিসফিস করে সবাই বলছে। মুখে ওদের দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখে ক্লান্তি। যেন কতকাল এইসব মানুষজন অন্নাভাবে অথবা এক হাহাকারে ভুগছে। আবুলের মুখ দিলীপ মনে করতে পারছে না। বোরখার নিচে মিনুবৌদির মুখ সে চিনতে পারবে না।

সে মিনু বৌদিকে খুব কম দেখেছে ওদের আড্ডায়। স্কুলের চাকরি করে মিনুবৌদি কোনদিন সময় করে আড্ডা দিতে আসেনি। বড্ড ঘর-মুখী মেয়ে। সারাক্ষণ ঘর আর সংসার। এবং ঘর সাজাবার বড় বাতিক তার। আড্ডায় এসে সমসের হাসতে হাসতে বলেছে, তোদের ভাবির কাণ্ড আর বলিস না! মাসের শেষ। একগাদা আবার বই আনিয়েছে ও-পার থেকে। একদিন তোরা আয়। খাবি আমার বাড়িতে। আমরা তারপর গান গাইব। মিনু কতদিন বলেছে, দিলীপবাবুর কোন খবর নেই কেন? আসে না কেন? ও কি চাকরি ক'রে আর সময়ই পায় না!

—না রে না। তা না। দিলীপ মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করে নিজের কাছেই বোকা বনে গেল। সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, পুরানো স্মৃতি তাকে এত বেশি উত্তেজিত করছে, যেন সে তার সেই আকবর আলির রেস্টুরেন্টে বসে আছে। এবং বড় রাস্তা সামনে, সন্ধ্যা হলে সে এসে কেবিনের ভিতর বসত, এবং ছ'টা বাজলে আসবে সমসের, আনোয়ার, মলয়, আমিনুল, তারপর ওরা সারা সন্ধ্যা কি যে বলাবলি করত, দেশের রাজনীতির সঙ্গে ওরা তেমন জড়িত ছিল না।

তবু যেন ওরা জানত, ডাক এলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সবাইকে। কেবল কামাল ছিল ওদের ভিতর সবচেয়ে দামী এবং নামী মানুষ, সে কথা কম বলত। বলত, আমরা একদিন এই বাংলাদেশে সবাই মিলে সমস্বরে গান গাইতে পারব। সবাই মিলে যখন উদাত্ত কণ্ঠে গাইব, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে চাই না আর—কি আশ্চর্য, শরীরের লোমকূপে লোমকূপে এক তীর্যক বহ্নি

ফুটে উঠত। সবার ভিতর এক আশ্চর্য ভালবাসা গড়ে উঠত তখন। কেউ আর নীচ হীন অথবা সংকীর্ণতায় ভুগে অন্য রকমের চোখ করে রাখতে পারত না। ওরা তখন কোন গাছের নিচে অথবা নিতাইগঞ্জের মাঠ পার হলে বড় কলের চিমনি, তারপর শীতলক্ষ্যা নদী, নদীর চর; ওরা চরে বসে চুপি চুপি গাইত, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ আর খুঁজিতে চাই না।

এসব মনে হলেই মনে আসে, সে যেন কবে, দিনক্ষণ সে এখন ঠিক বলতে পারে না, মনে আছে একবার সমসের, কামাল আনোয়ারকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওর বাড়ি। সে এবং মলয় সঙ্গে ছিল। ঘরে ঢুকতেই কামাল দেখল, দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, নজরুলের ছবি। আর আশ্চর্য, এই বাংলাদেশে সে কি করে জীবনানন্দেরও একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। মিনুবৌদি বলেছিল, বাংলাদেশ বলতে যা বুঝি—বলে সে তিনজনের ছবির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল।

কামাল বলেছিল, মিনু তোমার ভয় করে না?

—কিসের ভয়?

—সরকার। সরকারের ভয়?

—কোন সরকারের কথা বলছ কামাল?

—এই সরকার। যে সরকার আমাদের বেয়নেটের তলায়, বুটের তলায় পিষে মারছে।

—তাদের ভয় পেলে আমাদের চলবে কেন? তারা কে এ-দেশের?

কামাল বলেছিল সমসেরকে—তোর বিবির এত সাহস কি করে হল রে?

—কি জানি।

মিনু ছবিগুলোর দিকে হাত তুলে দেখিয়েছিল। তারপর এক অদ্ভুত মায়াবী চোখে তাকিয়ে বলেছিল, ওরা আমাকে সাহস দিয়েছে কামাল, ওরা।

কামালের চোখে সেদিন এক বেদনাকাতর ছবি। সে-ও যেন এটা মনে মনে বোঝে। অথচ কিছু করতে পারছে না। মিনুবৌদির কথাগুলো অন্য সময় হলে বড় নাটকীয় মনে হয়। অথচ আশ্চর্য, সেদিন ওর কাছে মিনুবৌদির সে-সব কথা রক্তে আগুন ধরানোর মত। আদৌ নাটকীয় মনে হয় নি। মিনুবৌদি কি করে তাদের সবার প্রাণের কথা খুব সহজে বলে দিতে পেরেছিল।

দিলীপ লুঙ্গিটা এক হাতে ধরে হাঁটছে। সে মেহনতী মানুষের ভঙ্গীতে হাঁটছে। শহরে এসে যেন সে তাজ্জব বনে গেছে। দাড়ি গালে। একেবারে ধর্মীয় চেহারা করে রেখেছে। সে দেখছিল ভিড়ের ভিতর কোথায় সেই তালপাতার পাখা। কোথায় বদনা হাতে নাবালক দাঁড়িয়ে আছে। সে ভিড়ের ভিতর, কারণ, কেউ কেউ বসে আছে, বিছানাপত্র, তোরঙ্গ যে যা সঙ্গে পেরেছে এনেছে। কেউ কেউ দু-দিনের উপর হবে এখানে আটকা পড়েছে। লাকসাম যাবে কেউ, কেউ ভৈরবসেতু পার হবে। কেউ কেউ যাবে নসিন্দি-জিনার্দি হয়ে আরও দূরে। কেউ যাবে বাবুর হাটে অথবা গোপালদি। আড়াই হাজার যাবা যাবে তাদের ট্রেনের কেউ খবর দিতে পারছে না। সে ভিড় ঠেলে যাচ্ছে। শহর খালি করে যারা চলে যাচ্ছিল, তারা একটা এমন গেঁয়ো লোক দেখে ভাবল, মানুষটা কোন খবর রাখে না। এখানে মরতে এসেছে।

যেন এখন মনে হয় ওর হাতে বাঁশি থাকলে, এই যেমন তাল-পাতার বাঁশি, সে বাঁশি বাজিয়ে ভিক্ষা করতে পারত। সে খানেদের কাছে গিয়ে রঙ্গতামাসা করতে পারত। পরাণে তার ভয়-ডর বলে কিছু নেই। ওদিকে শহরের বড় স্কুল বাড়ি যে আগুনে পুড়েছে, কামানের গোলায় কলেজের উঁচু থাম্বা অথবা সব মীনার গম্বুজ যে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, মানুষটাকে দেখলে তা পর্যন্ত কেউ টের পাবে না।

তালপাতার পাখাটা তখনও নাড়ছে মিনু। আর অধীর চোখে

কেবল তাকাচ্ছে। কখন যে পাশে দাঁড়িয়ে কেউ বলবে 'সজনে ফুল'। চেনার উপায় থাকবে না। কিছু মানুষ এরই ভিতর খানেদের টাকার গোলাম হয়ে গেছে। সুতরাং মিনু আবুলকে কাছে টানলে শুনতে পেল, সজনে ফুল।

এদিক-ওদিক না তাকিয়ে মিনু খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, সজনে ফুল। এবং কোন দিক থেকে কে বলছে, চোখ তুলে তাকাতেই সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। মানুষটাকে অন্য সময় দেখলে ভয় পেত। চোখ-মুখের কি চেহারা করে রেখেছে। তবু এর ভিতর বুঝতে আদৌ কষ্ট হল না, দিলীপবাবু। সে দিলীপবাবুকে বছর তিন আগে দেখেছে, তারপর নানা কারণে দেখা হয় নি। অথচ এখন দেখে সে তাজ্জব বনে গেছে।

দিলীপ বলল, তাড়াতাড়ি হাঁটেন।

মিনু আবুলের হাত ধরে হাঁটতে থাকল।

দিলীপ বলল, আয় বেটা তরে কান্দে লই।

—না, আমি হেঁটে যাব।

—তাড়াতাড়ি যাইতে হইব।

—আমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি।

—তুই আমাগো লগে হাইটা যাইতে পারবি না।

—ঠিক পারব। চলুন।

স্টেশন থেকে একটু নেমে যেখানে নবগোপাল দাসের মিষ্টির দোকান ছিল, এবং একটা সরু গলি নদীর দিকে চলে গেছে সেখানে দিলীপ বলল, ছ্যান সব আমার হাতে।

মিনু বোরখাটা খুলে ফেলতে চাইলে, আরে না, এহনে খুইলা ফ্যাললে চলব না। কখন খুলতে হইব কমু।

মিনু বলল, আপনাকে প্রথমে চিনতেই পারছিলাম না।

—এখন তো চিননের কথা না। কাইল সারারাত ঘুমায় নাই। মকবুল, নলিনী, রহমান সবাই এক এক কইরা জলের অতলে ডুইবা গেছে। সব খবর পাইছেন আশা করি।

—পেয়েছি।

ওরা এখন যে পথ দিয়ে হাঁটছে সেখানে কোন আলো নেই। আলোর থাম সব কারা উপড়ে ফেলেছে। এটা শহরের নদীর পাড়ের দিক। এখানে কিছু বড় বড় কলকারখানা আছে। এবং একটু দূরে বড় মসজিদ পার হলে আদমজীয় জুটমিল পড়বে এক এক করে। নদীর চরে দাঁড়ালে জুটমিলের চিমনিগুলো সারি সারি দেখা যায়। ওরা সরু গলিতে যেই নদীর চরে পড়বে তখনই চিমনিগুলি আকাশে ভেসে উঠবে। কিন্তু আজ তারা জানে, কিছুই দেখতে পাবে না। শহরের এ-পাশটায় মুক্তিফৌজের লোকেরা আতর্কিতে আক্রমণ করে জায়গাটাকে এখনও নিজেদের দখলে রেখে দিয়েছে। ফলে যে-কোন সময় এদিকটাতে বড় বড় ট্যাঙ্ক এসে নদীর চরে যত মানুষ আছে, জেটি আছে এবং জলে যত নৌকা অথবা লঞ্চ আছে, কামান দেগে বিনষ্ট করে দিতে পারে।

মিনু হাঁটতে হাঁটতে বলল, আপনারা দুপুরে খেয়েছেন তো?

—খাইছি! রাস্তায় এক মিঞাজানের বাড়িতে মুরগির মাংস ভাত।

—ফিরে এলে একদিন আমি আপনাদের সবাইকে মুরগির গোস্ত ভাত খাওয়াব।

—তাহলে কিন্তু আমার জন্য আলাদা আস্ত একটা মুরগী লাগব।

আবুল ছিল মাঝখানে। ওর দিলীপ কাকার খাই খাই ভাল লাগছিল না। সে বলল, আপনি আস্ত খেলে আমরা খাব কি?

—না না, আস্ত খামু না। তুই আমি ভাগ কইরা খামু।

এদের দেখলে কে বলবে, এখন ওরা যাচ্ছে জীবনপণ করে, ওরা যাচ্ছে নদীর জলে ঘাসি নৌকায়, ওরা যাবে একটা কাঠের পেটি নিয়ে। ওটা ওদের শুধু পৌঁছে দেবার কথা। কোনরকমে পৌঁছে দিলেই ওদের ছুটি। ওরা আবার অন্য জায়গায়, সব বোধ হয় কামাল ঠিকই করে রেখেছে, খুব নির্বিঘ্নে শুধু পৌঁছে দেওয়া। পৌঁছে দিলেই ওদের ছুটি। ওরা রাস্তায় যে ভয়াবহ সব জায়গা আছে, মিলিটারি ছাউনি আছে নদীর পারে এবং যে-কোন সময় আতর্কিতে আক্রমণ

ঘটলে ওদের জান মান কবুল করতে হবে—এসব এখন আদৌ ভাবছেই না। বরং যদি বলা যায়, এমন চাঁদের রাতে একটু গান গাইলে কেমন হয়! ওরা এখন যেন গান গাইতে গাইতে নেমে যাবে। প্রায় কোন শুভকাজে যেন যাবে, কোন উৎসবে যোগদান করতে যাবে—ওরা কেউ এখন নিজের কথা ভাবছে না।

মিনু একসময় শুধু বলল, দিলীপবাবু আপনি মাসিমার এক ছেলে?

—না, দুই পোলা আমরা।

—দুজন? কৈ আগে তো বলেন নি?

—কথাটা কওয়নের না।

—কেন এ-কথা বলছেন?

—.. গাছিল সেও এহনে আকাশে বাতাসে। বাঁইচা নাই।

—কি হয়েছিল তার?

—কি আর হইব।

—বিনা অসুখে মারা গেল?

—অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নাই।

—তবে কিসে?

—দাঙ্গায়। দেশ যখন ভাগ হয় তার কিছু পরের কথা। মনে নাই সব। তখন আমার বয়স আর কত! পঞ্চাশ সালে হইব। কদমপুরের ঘাটে দাদায় আমার চিত হইয়া পইড়া আছিল।

মিনু যে কি বলবে তারপর বুঝতে পারছে না। ওর কেন জানি পা কাঁপছে। এই মানুষ তার সঙ্গে যাচ্ছে আজ, বাংলাদেশের হয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। সে কেমন দুর্বল বোধ করল। বলল আপনার দাদা থাকলে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা বেশি হত।

—তা হইত।

মিনু বলল, দেশ স্বাধীন হলে ওর একটা ছবি দেবেন আমাকে।

—ছবি দিয়া কি হইব?

—ঘরে টাঙাব।

—আপনের না বৌদি, এই ছবি টানানর বড় বাতিক।

—কি আর করব বলুন। ছবিতে মানুষকে ধরে রাখা যায় না। তার স্মৃতিকে আমরা ধরে রাখি। এটা আমার ভাল লাগে।

—যান, দিমু। দ্যাশে শান্তি আসুক, আইলে দিমু।

আবুল বলল, আম্মা আমার ছবি টাঙাবে না?

—তোর ছবি তো ঘরে আছে।

—আরও বড় ছবি।

—বড় কাজ যারা করে তাদের বড় বড় ছবি টাঙাতে হয়।

—দিলীপকাকা তাই বুঝি?

—মাইনষে তো তাই কয়।

ওরা এবার ডিঙ্গিগুলো পার হয়ে যাচ্ছে।

দিলীপ আঙুল তুলে বলল, ঐ জেটির নিচে সমসের বইসা আছে। আর কিছু সময় আপনাকে হাঁটতে হইব।

—তবু যা হোক আমি বুদ্ধি করে স্টেশনে এসে বসেছিলাম। তা না হলে কালীবাজার পার হয়ে আমাকে নিয়ে আসতে আপনাদের অনেক দেরি হয়ে যেত।

দিলীপ এত যে কথা বলছে, এত যে খোলামেলা কথা, তবু কেন জানি মিনু এবং আবুলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভয়াবহ ব্যাপার, এটা ঠিক করে নি, সমসের এমন ভাবছে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী সে সমসেরের আজ্ঞা শুধু মাথা পেতে নেবে। এ-সময় তার কোন প্রশ্ন করার অধিকার নেই। নতুবা এখনই সে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসত। কি দরকার এত বড় একটা রিস্ক নেওয়ার? কিন্তু কাকে বলবে? সবাই কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান এই আশায় বসে রয়েছে! এখন কিছু বলতে গেলেই মিনু বলবে, মশাই আপনি বড় স্বার্থপর মানুষ। আমাদের এত ছোট ভাবেন কেন? এমন বড় কাজে কিছু করতে না দিয়ে, একা খুব বাহবা লুটতে চান?

কিন্তু এই ছোট্ট ছেলে আবুল। ওকে সঙ্গে কেন? সে কি করবে? তার করার কি থাকতে পারে?

দিলীপ তখনই দেখল ওরা জেটির কাছে এসে গেছে।

আমিনুল আর সমসের ওদের দেখে এগিয়ে আসছে।

আবুল ছুটে গিয়ে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মিনু বোরখাটা খুলে ফেলল। ভিতরে সে ঘেমে গেছে। শাড়ি সায়া ভিজে জবজব করছে। সে বুঝতেই পারে নি, স্টেশনে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল। কি গরম, আর তার ভিতর বোরখার অন্তরালে থাকা কি ভীষণ কষ্টকর! এতটা পথ সে হেঁটে এসেছে না ছুটে এসেছে, বলতে পারছে না। সমসের আমিনুলকে দেখে ওর বুকে জল এসে গেছে। এমন কেন যে হয়! বার বার সে যে ভাবছে ভয় পাবে না, বার বার সে যে ভেবেছে এমন দিনে নিজের কথা ভাবতে নেই, তবু কেন যে নিজের কথা না ভেবে পারছে না! নিজের কথা বলতে সে বোঝে, আবুলের কথা, সমসেরের কথা। সে একা আর নিজের ভিতর থাকে কি করে! সে তো সমসের আর আবুলকে নিয়ে। সে বোরখাটা খুলে সমসেরের হাতে দিল। সমসের কিছুতেই মিনুর দিকে তাকাচ্ছে না। সে আবুলের হাত ধরে হাঁটছে বটে, কিন্তু আবুল সম্পর্কে কোন কথা বলছে না। অথবা সে যেমন অফিস থেকে ফিরে আবুলকে আদর করত, আজ সে তাও করতে পারছে না। আবুলের খুব অভিমান হচ্ছে। বাবা তার সঙ্গে কথা বলছে না। বাবা কি ভেবে ফেলেছে এখন ওরা সবাই সমকক্ষ। আবুল এ-ক'দিনে বাংলাদেশের চেহারা দেখে ধরে ফেলেছে, কাউকে আর ছোট হয়ে থাকা চলবে না। বাবা এসেই যখন অত্যাচারের কথা বলত, আবুল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠত। বাবা খানেদের এত বন্দুক গোলা আছে, আমাদের কিছু নেই কেন বাবা? ওরা এত বন্দুক গোলা পেতে পারে আমরা পেতে পারি না কেন? আমাদের বন্দুক নেই কেন? তুমি নিয়ে এস, আমরা যুদ্ধ করব।

সেই কবে থেকে এমন হবে যে. কথা ছিল। সমু এসে ছেলেকে বুকে তুলে নেবার সময় বলত, নিয়ে আসব। তুই আমি সবাই একদিন দেখবি বাংলাদেশের সৈনিক হয়ে গেছি।

সেই কবেকার কথা। বাবা তখন কি হাসতে পারত!

আবুল হাত ধরে যাচ্ছে বাবার, কাছে কোথাও কোন ঝোপ-জঙ্গল থাকলে সে কোন পাখির ডাক শুনতে পেত। রাতে বাংলাদেশের পাখ-পাখালির গান সে শুয়ে শুয়ে তার জানালায় শুনতে পেত। কেন জানি এ-সময় তেমন পাখির ডাক শুনতে পেলে সে আরও বেশি সাহস পেত। বাবা কথা বললেও সাহস পেত। কেউ কথা বলছে না। চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে। আমিনুল চাচাকে সবাই অনুসরণ করছে। যেন কথা বললেই বিপদ আসবে। জ্যোৎস্না যত বেশি থাকার কথা ছিল তত বেশি নেই। অস্পষ্ট ম্লান এক অন্ধকারে চারপাশের এই জগৎ, জগৎ বলতে জেটিখানা, নদীর চর, অসংখ্য নৌকাএবং গাদাবোট সব মিলে অদ্ভুত নীরবতা। ওরা সেই নীরবতা, কথা বলে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করছিল না। বোধহয় আবার কারফু জারি হয়ে গেছে। তাই লোকজন আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিমেষে সব কেমন উধাও হয়ে গেছে।

সেদিনের সেই কথা এমন নির্মমভাবে সত্য হবে সমসের স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। সে বোধ হয় সেজন্য কথা বলতে পারছে না। কথা না বললে মিনু কষ্ট পাবে, আবুল কষ্ট পাবে। কিন্তু সে জানে, সে এ সময় কোন কথা বললেই আবেগে ভেসে যেতে পারে। সে তার একমাত্র সন্তান দেশের জন্য দিয়ে দিচ্ছে। মিনুকে ছেড়ে দিতে ভিতরের সব কিছু টাটকা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এত বেশি কষ্টটা যে কিছুতেই মুখ খুলতে পারছে না। এমন কি বলতে পারল না, এখন আর আমরা কেউ কিছু বলতে পারি না মিনু। এখন শুধু নির্দেশ পালন করতে পারি।

মিনুই প্রথম বলল, আর কত দূর?

আমিনুল বলল, এসে গেছি ভাবি।

ওরা চরের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। ওরা যতটা পারছে নদীর জলের কাছাকাছি থাকছে। এবং এ সময়েই মনে হল ঠিক ঢাকা

কটন মিলের গফুর মিঞার সরাইখানার গলি থেকে কেউ ফ্ল্যাশলাইট ফেলছে। আলোটা ঘুরে ঘুরে চারপাশে কি খুঁজছে। সমসের বল্ল' শীগ্গীর শুয়ে পড়। ওরা নৌকার আড়ালে শুয়ে মাথা তুলে রাখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ক'টা শব্দ—ব্যাঙ্ ব্যাঙ্। মনে হল নদীর ওপারে ওরা মেশিনগান দাগছে।

দিলীপ সমসেরকে বলল, বোধহয় টের পাইয়া গেছে।

সমসের চিৎকার করে বলল, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যা। তোরা দেখ নৌকায় উঠতে পারিস কি না।

মিনু আঁচল কোমরে গুঁজে নিয়েছে। সে ফিস ফিস করে সমসেরকে বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

সমসের কথা না বলে খুব কাছে এগিয়ে গেল। ওরা নৌকাগুলোর পাশে পাশে ক্রশ করছে। গাবের গন্ধ কাঠের গন্ধ এবং বাঁশ পচা গন্ধ উঠছে জায়গাটায়। পিছনে আমিনুল আবুলকে নিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে। দিলীপ মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিচ্ছে এবং যখনই আলোটা ঘুরে অন্যদিকে পড়ছে তখুনি সে উঠে উঠে দৌড়ে যাচ্ছে। কোনরকমে কাঠের বাক্সটাকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারলে ওদের কষ্ট হবে না টেনে নিতে। প্লাস্টিকের আবরণে ভেতরটা মোড়া। দরকার হলে জলে ডুবিয়ে দিলেও সেই সব প্রাণের চে দামী গুলি-গোলা বন্দুক নষ্ট হবে না। কখন কি ঘটবে কেউ বলতে পারছে না। যতটা পেরেছে কামাল, প্যাকিংয়ে কোন দুর্বলতা থাকতে দেয় নি।

সমসের বলল, কিছু বলবে বলছিলে?

ওরা এখন পাশাপাশি। মিনু সমসেরের হাতে হাত রাখতেই টের পেল হাতটা ভীষণ গরম। শরীরে হাত রাখলে টের পেল গা-টা পুড়ে যাচ্ছে। সে ভীষণ উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তোমার শরীরে জ্বর। তোমার অসুখ হয়েছে।

—তুমি যে বলছিলে মিনু কিছু আমাকে বলবে? সমসের চেষ্টা করছে মিনুকে অনন্যমনস্ক করে দিতে।

—তুমি বের হয়ে যাবার পর কামাল লোক পাঠিয়েছিল।

—আবার লোক পাঠাতে গেল কেন?

—খানেরা বিকেলে এসে আমাদের পাড়াটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে ঠিক করেছে।

সমসের খুব শক্ত হয়ে গেল।

—আমার যা কিছু ছিল সব ওরা নষ্ট করে দেবে।

—এখন ওসব ভেবে লাভ নেই।

—বাড়ির বাইরে এসে দেখলাম কারা দেয়ালে ক্রশ-চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। তুমি কিন্তু আমাদের নৌকায় তুলে দিয়ে সেখানে আর যেও না।

সমসের এখনও চুপচাপ। এই ক্রস-চিহ্ন মানে, ওদের বিনষ্ট কর। ওরা পাকিস্তানের শত্রু। ওর চোখের সামনে সেই হত্যালীলার ছবি ফুটে উঠলে মনে হল সমসের দ্বিগুণ সাহস পেয়ে যাচ্ছে।

—ওরা আমাদের আর সহজে খুন করতে পারবে না মিনু। আমরা আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব না। এবং এটুকু ভাবতেই সে কামালের উপর কৃতজ্ঞতায় খুশি হয়ে উঠল। কামালের পরামর্শমতো বের না হয়ে পড়লে খানেরা ওকে, ওর আবুলকে, মিনুকে, দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করত। সমসের এবার মিনুর খুব কাছে গিয়ে বলল, তোমার মুখটা দেখি মিনু।

মিনু আরও কাছে মুখ তুলে আনলে আবার সেই গুলির শব্দ এবং ফ্ল্যাশলাইট। ঠিক জাহাজের বাতিঘরের মতো ঘুরে ঘুরে চারপাশটায় কি দেখে ওরা আতঙ্কিত হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে সেই শব্দ—ব্যাঙ, ব্যাঙ্ ব্যাঙ্। ঝন ঝন করে বাজছে, যেন কোথাও কাঁচ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে অথবা প্রতিধ্বনি উঠছে। লনচগুলোতে আলো নেই। কেবল মরাজ্যোৎস্না চারপাশে, আর অদ্ভুত সেই ভয়ঙ্কর ফ্ল্যাশলাইট, জ্বলে উঠলেই মনে হয় অতিকায় এক সরীসৃপ নিশ্বাস ফেলছে—নিশ্বাসের সঙ্গে আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে। মিনু ভয়ে সমসেরের বুকে মুখ লুকিয়ে রাখছে।

মিনু আজ সুন্দর একটা নীলরঙের শাড়ি পরে এসেছে। মিনু কপালে সুন্দর কাঁচপোকার টিপ পরেছে এবং মনেই হয় না যাচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর কাজে। সাজের ভিতর মিনু বড় বেশি সরল সহজ হয়ে আছে —সে মিনুর চিবুকে তুলে চুমু খেল। আমি মিনু তোমার, চিরদিনের তোমার, এই মাটিতে ঘাসে যেখানেই পড়ে থাকি, মরে থাকি, তুমি জানবে মিনু, আমি তোমার সমসের। আমি তোমার বাংলাদেশের মাটিতে ঘাসে ডুবে যাব মরে যাব, আমরা তবু স্বাধীনতার কথা ভুলব না মিনু।

তিন

বুড়ো রহমত মিঞার কাছারি বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। এখানে খুব ঘন নয় নৌকাগুলো। ফাঁকা ফাঁকা। নদীর জল ঘোলা। শীতলক্ষ্যার জলের রং কেমন সাদা সাদা। এখন তেমন জল নেই, কম জল কোথাও সেই পার হয় গরু পার হয় গাড়ি, তার ওপর জল এমন ঘোলা যে মুখে দিতে কষ্ট হয়। আর এই জলে কত মৃতদেহ ভাসছে। কাক-শকুন উড়ছে। শহরের কোথাও গাছপালা নেই, কারণ সব গাছপালা কেটে পথ আটকে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং নিশীথে সব শকুনেরা আকাশে উড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সকাল হলে টের পাবে এই ঘাটে অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে। সমসেরদের কেউ মরে যায় নি, কারণ ওরা জানত আক্রমণ অনিবার্য। ওরা খুব সন্তর্পণে চলাফেরা করছিল, ওরা বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হলেই নৌকার আড়ালে অথবা জেটির অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ছিল। কিন্তু যারা যাবে চরসিন্দুর অথবা কালীগঞ্জে, অথবা যাদের মুন্সিগঞ্জে যাবার কথা, তারা নৌকা ছাড়বে বলে তাড়াতাড়ি শুঁটকি মাছের ঝাল দিয়ে ভিজা ভাত মেখে বেশ খেয়ে নৌকা ছাড়বে ভেবেছিল, তারা কি করে জানবে, এখানে মুক্তিফৌজের একটা দল মাল পাচার করছে! তারা কি করে জানবে দানবের মত খানেরা এসে কামান দেগে অথবা মেশিনগান দেগে ওদের চিৎপাত করে ফেলে রেখে যাবে! ওরা এমন হবে জানত না, ওরা সোয়ারি নিয়ে রওনা দেবে, তখন কিনা বৃষ্টির মতো গুলি!

সুতরাং সকাল হলে সবাই টের পাবে অথবা ভয়ে আঁতকে উঠবে এমন এক দৃশ্য নদীর ঘাটে দেখে। চিৎপাত হয়ে রক্তাক্ত শরীর মুখ নিয়ে নিরীহ মানুষেরা নৌকার পাটাতনে পড়ে আছে। খানেরা ভীত,

সন্ত্রস্ত। সন্ত্রস্ত না হলে ওরা এভাবে গুলি চালাবে কেন? ওদের কাছে সব মানুষই এদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা। কি যে ওদের ক্যামোফ্লেজ হবে, খানেরা বুঝি তা জানে না।

গুলির আওয়াজ থেমে গেলে ওরা কিছু সময় চারপাশে নজর রাখল। চারপাশের নৌকাগুলি থেকে মড়াকান্না ভেসে আসছে। চিৎকার এবং গোঙানি। রাতের অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ভয়াবহ। আকাশে সব তারা নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। ফ্ল্যাশলাইট আর পড়ছে না। পড়লে ওরা কিছু কিছু উৎকট দৃশ্য দেখতে পেত। সমসের দাঁতে দাঁত চেপে বলছে—বেইমান।

এমন ভাবে আর কতকাল, হায় খোদা, অথবা যদি এই পৃথিবীর কোথাও কোন মুক্তির নিশ্বাস ফেলার জায়গা থেকে থাকে তবে যেন বলার ইচ্ছা, হায় খোদা মেহেরবান, তুমি ছ্যাখো ওদের। এবং মাঝে মাঝে ওরা দেখতে পেল নৌকার ভিতর মা রক্তবমি করছে আর কোলে শিশু তার দুহাত শক্ত করে ধরে রেখেছে স্তন, দুধ খাবে বলে; কারণ সে'তো বুঝতে পারছে না মায়ের গলা ফুটো হয়ে গেছে, সে ক্ষুধায় স্তন থেকে শেষ দুধটুকু বের করার জন্য চুষে চুষে স্তন খাচ্ছে। হায়, হায়, এ দৃশ্য দেখা যায় না।

সমসের তাড়াতাড়ি জল ভেঙে পাটাতনে উঠে গেল। কাতর শব্দ আসছিল। কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। দিলীপ বিরক্ত হচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গেলে, এ-অঞ্চলে ওদের ভয় থাকার কথা নয়। কেবল নিরিবিলি গ্রাম। এবং নৌকাটাকে টানতে হবে না তবে, জল বেশি বলে বৈঠা চালাতে পারবে। নদীর পাড় থেকে ওদের কেউ দেখতে পাবে না। কাশবনের ভিতর দিয়ে নৌকা চালালে ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।

আর তখন কিনা সমসের অন্য নৌকায় উঠে কি খুঁজছে! আমিনুল বলল, সমসের মায়া-মমতা বুকে রাখলে কষ্ট। তাড়াতাড়ি পাড়ি দিমু কি কইরা তা না, অহন গ্যাছেন আবার কেরায়া নৌকায়।

মিনু বলল, তুমি ওকে নিয়ে কি করবে ?

—তোমার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।

—আচ্ছা তুমি কি পাগল ?

সমসের কোন কথা বলল না। শিশুটি বোধহয় মেয়ে। ফ্রক পরা, প্যান্ট হিসি করে ভিজিয়ে দিয়েছে। সমসেরের হাতে এসে প্রথম খলবল করছিল। এবং হাসছিল। সমসের বুঝল, মায়ের দুধ এবং রক্ত দু'ই চুষে ওর পেট ভরে গেছে। মুখে রক্ত লেগে গেছে। সমসের নদী থেকে জল তুলে মুখ ধুয়ে দিল। এবং মিনুর কাছে বলল, রাখ। তোমাদের যা হয় এরও তাই হবে।

দিলীপ আর থাকতে পারল না—সমসের তুই একটা পাগল। তরে পাগল কমু না ছাগল কমু বুঝতে পারতাছি না। আমাগো এখ্‌ন মরণের সময় নাই, তুই এডা কি করলি !

—চোখের সামনে পড়ে গেলে কি করি বল ? না নিলে হামাগুড়ি দিয়ে জলে পড়ে যেত। জলে ডুবে যেত। তারপর সামান্য রসিকতা করার প্রলোভন সামলাতে পারল না। বলল, ভেবে নে এও আমাদের একজন ভবিষ্যতের মুক্তি-যোদ্ধা।

দিলীপ এ-সময় অস্পষ্ট আলোতেও দেখল বেদনায় সমসেরের মুখ থম-থম করছে। সে নিজের ছেলেটার দিকে কিছুতেই তাকাতে পারছে না। কিছু বলছেওনা তাকে। কিছু বলতে গেলেই হয়তো ভেঙে পড়বে। আবুল, তার মায়ের কোলে সেই শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা যা কিছু পারছি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, এমন মুখ এখন মিনুর। কোলে আঁচলের ভিতর সেই বালিকা, যেন ছোট্ট একটা বোন মিলে গেছে আবুলের। সে এবং মা পাটাতনে পাশাপাশি বসে আছে। বাবা গলুই'র দিকে। দিলীপচাচা নৌকাটাকে টেনে টেনে গভীর জলে নামিয়ে দিচ্ছে।

নৌকাটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে দিলীপ লাফ মেরে উঠে পড়ল। এখন আর আকাশে জ্যোৎস্না নেই। পাটাতনের নিচে সেই বাক্সটা।

মেয়েটা মিনুবৌদির কোলে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত বাড়ছে ক্রমশ। ওরা কাশবনগুলোর পাশ দিয়ে গেলে কিছু কীটপতঙ্গ অথবা ফড়িং উড়ে এসে নৌকায় পড়ছে। ওদের নৌকা ক্রমে গঞ্জ পিছনে ফেলে দামগড়ের দিকে যাচ্ছে। কাছেই সেই ব্রহ্মপুত্রের খাঁড়ি নদী এসে শীতলক্ষ্যায় মিশেছে। অন্ধকারে ওরা সেই নদীটির উদ্দেশ্যে এখন নৌকা বাইছে। সমসের খাঁড়ির মুখে নেমে যাবে। সে এখনও বোধহয় ঠিক করতে পারছে না কি করবে। নয়তো যেমন কথা ছিল—ঘাসি নৌকাটা এলেই সমসের ওদের তুলে দিয়ে চলে যাবে, অথচ সমসের যাবার নাম করছে না। দিলীপের মুখ ক্রমে কঠিন রুক্ষ হয়ে উঠছে। সে বুঝতে পারছে, সমসের মায়ায় এমন আটকে পড়েছে। যতটুকু সময় নিজের মানুষের কাছে থাকা যায়। দিলীপ এটা পছন্দ করছে না। যেমন সে পছন্দ করেনি আগ বাড়িয়ে একটা ঝামেলা বয়ে আনা, অন্য নৌকা থেকে। সে জানে ওটাতে কারা যাচ্ছে। এ নৌকাগুলি সাহাদের। সাহা'রা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। ঠিক-ঠাক হয়তো চলে যেত, বাধ সেধেছে এই জেটি থেকে মুক্তি-যোদ্ধাদের জন্য রসদ যাচ্ছে। খানেরা এত ভীত হয়ে পড়েছে যে কিছুতেই চরে নেমে এসে সরেজমিনে দেখতে চাইছে না। দূর দূর থেকে কামান অথবা মেশিনগান দেগে সব নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

এ-ভাবে দিলীপ জানে সমসের নৌকা থেকে এই যে শিশুটিকে তুলে এনেছে সে সাহাদের কেউ হবে। দিলীপের কাছে সবচেয়ে শক্ত কাজ এই কাঠের বাক্সটা পৌঁছে দেওয়া। সমসেরের নির্দেশমতই দিলীপ সব করছে। সমসেরেরই নির্দেশ ছিল, মায়া-মমতা আমাদের এখন রাখলে চলবে না। আমরা এক পরিবারের ছেলে। সেই পরিবারের নাম বাংলাদেশ। আমাদের এখন আর কোন ব্যক্তিগত সত্তা নেই। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব আর্মসের। আমাদের দলবল আছে। আছে খাদ্য। শুধু আর্মস অ্যাণ্ড অ্যামিনিউসানের জন্য সংগ্রাম বিলম্বিত হতে পারে। সমসের যখন কথা বলে, খুব গুরুত্ব দিয়ে কথা বলে।

মাঝে মাঝে সাধুভাষা প্রয়োগ করে তার বক্তব্যের দৃঢ়তা প্রকাশ করতে চায়। সে'ই বলেছিল, একটা বন্দুক ছিনিয়ে নেবার আগে আমাদের জান কবুল করতে হবে। অর্থাৎ সে যেন বলতে চেয়েছিল; জীবন পরে, অস্ত্র আগে। আর সেই সমসেরই কি না একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসল যাবার মুখে। সমসের নেমে যেতে চাইছে না। ওর আরও অনেক কাজ। সমসের সংগঠনের ভিতর আছে। সমসেরের মত মানুষেরা শুধু ভাববে—কি ভাবে কোথায় কোন অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ ঘটবে, কোথায় কি ভাবে রসদ পৌঁছে দিতে হবে এবং কি ভাবে সব আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছে দিতে হবে। তা না করে সমসের কি না ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। দিলীপ ওর নেমে যাবার লক্ষণ না দেখে মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছিল। সঙ্গে আবার অপোগণ্ড জুটিয়েছে একটা!

এখন দামগড়ের কলকারখানাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না জল কম আবার এখানে। জায়গায় জায়গায় কচুরিপানা ঠাসা এবং দুপারে কোন সাড়াশব্দ নেই। সবাই ভয় পেয়ে গেছে। সবাই, রহস্যময় এক পৃথিবী এই মাটিতে জেগে উঠছে, টের পাচ্ছে। আর তখন কিনা মিনুবৌদির কোলে অপোগণ্ডটা কাঁদছে। টের পেয়েছে বুঝি মিনুবৌদি ওর কেউ হয় না। রক্তে যে কি মিশে থাকে! মিনুবৌদি নানাভাবে ওকে থামাবার চেষ্টা করছে। একটু আগেও বেশ চুপচাপ ছিল। এসব দেখে দিলীপ ভিতরে ভিতরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। ওর এখন হাত নিশপিশ করছে। সে হাত দুটো বাড়িয়ে বাতাসে কি যেন ধরতে চাইছে। বুঝি তার ঈশ্বরকে, অথবা মনে হয় সে দু'হাতের ফাঁকে সেই শিশুর কণ্ঠনালি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে। কারণ এভাবে কাঁদলে নদীর জল বেয়ে কান্নার শব্দ ওপারে উঠে যাবে। কে যায়! নদীর জলে নৌকা। কারা যায় ছাখো। ছাখো কোন স্বাধীন মানুষ গ্রামে গঞ্জে পালিয়ে যায়। নৌকা আটক কর। নৌকা আটকে সরেজমিনে তদন্ত। ভয় পেলে ওরা সরেজমিনে আসবে

না। সামান্য এই নৌকার উদ্দেশ্যে কামান দেগে জলের নিচে ডুবিয়ে দেবে।

সমসের বসেছিল চুপচাপ। আবার অতর্কিতে মেশিনগানের শব্দ ভেসে আসছে। জুটমিলের ডান দিকে মনে হয় শব্দটা উঠছে। ওখানে চটকল ইউনিয়নের কর্মীরা আছে। ওদের ব্যারাক হয়তো উড়িয়ে দিচ্ছে। অন্ধকারে সে দেখল, আগুনের গোলা উপরে উঠে শহরময় এক অতীব নৃশংস খেলার জন্ম দিচ্ছে। হাউইয়ের মত আকাশে বাতাসে আগুনের গোলা। বোধহয় কোন পল্লীতে ফসফরাস গ্রেনেড দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পল্লীগুলোয় কোথাও শন দিয়ে চালাঘর, কোথাও টিনের ঘর, বাঁশের বাতা দিয়ে বেড়া, কাঠের থাম। এবং মাটির দেয়াল একটাও চোখে পড়বে না। এমনিতেই গ্রীষ্মের দিন, রোদে খাঁ খাঁ করেছে সারাটা দিন। শন বেড়া, বাঁশ চাল উত্তপ্ত হয়ে আছে, সামান্য একটা দেশলাইয়ের কাঠি অজ্ঞাতে ফেলে দিলেই হাওয়ায় হাওয়ায় আগুন ভেসে যাবে, এবং ঘরগুলো জতুগৃহের মত দাহ্য হয়ে আছে বলে এক আগুনের খেলা, চারপাশে সেই খেলা যেন এক নৃসংশতার ছবি এবং আয়নার ভিতর ছবিটা কুণ্ডলিনি প্রায়। ওরা পশ্চিমের দিকে তাকিয়েছিল। সারা আকাশটা একটা চকচকে আয়না হয়ে গেছে। আগুন উপরে উঠে গেছে এত, যে ওদের নৌকার ভিতর সবার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিলীপ আর চুপচাপ থাকতে না পেরে বলল, কালীগঞ্জে মনে হয় আগুন লাগাইছে।

আবুল বলল, চাচা, আসমানটা লাল হয়ে গেল!

মিন্নু বাচ্চাটাকে অনেক চেষ্টা করে শান্ত করতে পেরেছে।

সমসের বলল, বোধহয় আমাদের পাড়াতে আগুন দিয়েছে।

আবুলের সহসা কি মনে পড়ে গেল। আসার সময় সে কি যেন ফেলে এসেছে। সে ভেবেছিল আজ অথবা কাল দেশ স্বাধীন হলে আবার ফিরে যেতে পারবে, যা ফেলে এসেছে সে আবার তা ফিরে পাবে। কিন্তু সমসের যেই বলেছে, বোধহয় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে,

তাতেই ওর মনটা দমে গেল। ওর একটা খাতা, বড় প্রিয় আর মায়ায় সে তার সেই খাতাটা যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছিল। খাতাটাতে সে তার প্রিয় খেলোয়াড়দের, অথবা বড় মানুষদের ছবি পেস্ট করে রাখত। ওটাতে কতদিন পত্রিকা থেকে ছবি কেটে কেটে জমা করেছে। প্রথম পাতায় সে হানিফের ছবি কেটে রেখেছিল। সে বলল, বাবা আমার খাতাটা তুমি খুঁজে ছাখো।

মিনু বলল, আবুল বাইরে বসে থাকিস না। ভিতরে আয়।

আবুল মা-র কথামত ছইয়ের ভিতর ঢুকে গেল। এখন দূরে দূরে শহর জ্বলছে বলে প্রায় দিনের সামিল হয়ে গেছে। সমসের বলল, এটা তোমরা ভাল করে দেখে নাও।

আমিনুল নৌকায় নেই। সে পাড়ে পাড়ে গুণ টেনে নৌকা নিয়ে যাচ্ছে। দিলীপ হালে বসে রয়েছে। যখন যেমন অবস্থা হচ্ছে তখন তেমন করতে হচ্ছে। গ্রীষ্মের দিনে জল থাকে না, এবারে মনে হয় নদীতে আরও জল কম। আর মাঝে মাঝে চর জেগে গেছে। মাছ ধরার জন্য যারা জঙ্গল ফেলে রেখেছিল, জলে, সে-সব এখন নদীর চরে অথবা জলের কিনারে। অন্ধকারে গুণ টানা বড় কষ্টকর। তাছাড়া আমিনুল কবে যে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল কলেজে পড়তে, সেই থেকে নৌকা বাওয়া, গুণ টানা, সব অভ্যাস কেমন তার উঠে গেছে। পায়ে ওর কেডস্ জুতো। কাশের বন থাকলে হাত-পা কেটে যাচ্ছে। সে কাঠের উপর গুণ-টানা দড়ি ফেলে হাঁটছে। মনে হয় কাঁধের চামড়া ছিঁড়ে গেছে এবং রক্ত পড়ছে। সে যে জামাটা গায়ে দিয়েছিল ওটাও বোধহয় ছিঁড়ে গেছে। কেমন জীর্ণ চেহারা! অথচ আমিনুল এতটুকু ভেঙে পড়ছে না। সে বলল, যার যার বায়ে। অন্ধকার নয় তেমন, তবু আমিনুল কেন যে কথাটা বলল! দিলীপ গলুইতে বসে চিৎকার করে উঠল, সজনে ফুল।

সজনে ফুলের গন্ধ নেই কিছু। ওরা গাছের ছায়ায় আছে।

এখানে নদীর পাড় খাড়া। মিনু মানচিত্রটার গায়ে উবু হয়ে দেখছে কোথায় নদী বাঁক নিয়েছে, কোথায় কোন মসজিদ অথবা মন্দির পড়বে! অলিপুরার বাজারে এখন কিছু নৌকা সব সময় ঘাটে বাঁধা থাকে। কোন গণ্ডগোল দেখা দিলে সেই নৌকার ভিতর মিশে গিয়ে ওরা অন্য ক্যামাফ্লেজে যেন ধরা দেয়। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালতে হচ্ছিল সমসেরকে। কারণ আগুনের হল্কা কমে গেলে মানচিত্রের সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিলীপও হাল থেকে দেখার চেষ্টা করছে। আবুল, ওর মা এবং বাবার পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

দিলীপ বলল, মিনুবৌদি তোমরা সব বুঝে নাও। আমি পরে তোমাদের কাছে বুঝে নেব।

সমসের এবার দিলীপের দিকে পেছন ফিরে তাকাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, আমাকে তোরা নাঙ্গলবন্দে নামিয়ে দিবি। গোয়ালন্দিতে অরুণ আছে, আমি সোজা ওর বাড়িতে গিয়ে উঠব। লালু, মেহের সবাই থাকবে। যদি পঞ্চমী ঘাটে দেখিস অসুবিধা, তবে দন্দির শ্মশানঘাটে চলে যাবি। ওখানে ক'টা দল থাকবে। মিনু তুমি নেমে যাবে, লাধুর চরে হাসিম থাকবে। তোমরা ওদের বাড়ির কুটুম। খুব সকালে দু একজন কেউ দেখে ফেললে বলবে, জয় বাংলা। তবে আর ভয় থাকবে না। পাশাপাশি নৌকা চলতে থাকলে, দিলীপ তুই যেন বলে থাকিস সজনে ফুল, তেমনি বলবি। নিজেদের মধ্যে আবার মারামারি বেধে না যায়।

দিলীপ বলল, আজকাল আবার খানেরা উর্দি না পইরা গঞ্জের মানুষের লগে মিশা থাকে। টের পাওয়া যায় না, জয় বাংলা কেডা, আর পাকিস্তানি কেডা।

—সজনে ফুল বললে ওরাও বলবে সজনে ফুল। দু নম্বর কোড বেলফুল। কামাল তিনটে নৌকায় আরও তিনটে ইউনিট পাঠাচ্ছে।

ওরা রূপগঞ্জ থানা আক্রমণ করবে। আর একটা দল যাচ্ছে নর্সিন্দিতে। কামাল সবই নৌকায় পাঠাচ্ছে, কারণ নৌকায় যেতে সময় বেশি, বেশি সময়ই সে নিচ্ছে। সন্দেহটা ছোট ছোট নৌকায় কম। তারপর একটু থেমে বলল, তবে সব জায়গাতেই ভয় আছে। তোমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। কথা আছে থানার লোকেরা আমাদের সাহায্য করবে।

এবার সে আবুলের মাথায় হাত রেখে বলল, দিলীপচাচা যা বলবে তাই করবে।

আবুল বলল, ওরা গুলি চালালে আমরা গুলি চালাব না?

—সে তোমার দিলীপচাচা জানে।

—আমি না থাকলে কত কিছু ঘটতে পারে! দিলীপ অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলল।

—তুই না থাকলে আমিনুল। আমিনুল না থাকলে মিনু। মিনু না থাকলে আবুল।

—এই অপোগণ্ডের কি হবে?

—সে আমাদের শেষ সৈনিক। যেখানেই যাবে বুকে রক্ত নিয়ে যাবে। জ্বলবে সারা জীবন। আবার আগুন জ্বলবে এই মাঠে-ঘাটে। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!

মিনু বলল, তারপর আমাদের কি করণীয় কিছুই বললে না।

—হাসিমের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকবে। তোমরা সবাই ওর পরামর্শমত তারপর থেকে কাজ করে যাবে। কবে আমাদের দেখা হবে ঠিক নেই। দেখা আর আদৌ হবে কিনা তাও বলতে পারি না।

মিনুর মুখটা বড় ম্লান হয়ে গেল। মিনু চুপচাপ থাকছে, থাকতে ভালবাসছে। সে এখন আর নিজের কথা ভাববে না, এমন কতবার ভেবেছে, অথচ সমসের যা বলল তা ওকে বড় কাতর করছে

ভিতরে ভিতরে। কিছুতেই সে মনকে বোঝ প্রবোধ দিতে পারছে না। ভিতরে সে ভীষণ ভেঙে পড়ছিল। হাহাকার করছে বুকটা। হাহাকার করলেই সে এই নৌকার পাটাতনে আবুলকে জড়িয়ে বসে থাকছে। কি নরম আর সুন্দর আবুলের চোখ-মুখ! বড় বড় চুলে আবুলের তেলের গন্ধটা কি যে ভাল লাগছে! সে আবুলের চুলে মুখ গুঁজে দিলে টের পায় ভেতরে ভেতরে কে আবার তাকে সাহস যোগাচ্ছে। চারপাশের বনলতা, নদী জল মাঠ এবং নদীর চরে কত রকমের পাখ-পাখালির কলরব তাকে নতুন এক জীবনের কথা, আশার কথা শোনাচ্ছে। সে বলল, তুমি সাবধানে থেকো, ঠাণ্ডা লাগাবে না, গায়ে জ্বর। মেহেরকে বলবে পাতলা করে যেন বার্লি করে দেয়। ভাত খেও না।

সমসের মনে মনে হাসছিল। নাঙ্গলবন্দের ভৈরবতলা ঘাটে নামিয়ে দিলে তাকে পাক্কা দুক্রোশের মত পথ হাঁটতে হবে। সে জানে সে ইচ্ছা করলে যে-কোন গ্রামে উঠে আশ্রয় চাইতে পারে, শুশ্রূষা চাইতে পারে। সব মানুষই তার আশ্রয়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগে যাবে। সে যে একজন মুক্তি-বাহিনীর মানুষ এ কথা জানলে কেউ তাকে অবহেলা করবে না। তবু কেউ কেউ যেন শ্বাপদের মত অন্ধকারে উঁকি দিয়ে আছে, স্বার্থবাজ সেই হিংস্র মানুষকে সে বিশ্বাস করে না। যে-কোন সময় তারা খবর পৌঁছে দিতে পারে, আমি তোমাদের হাতে একজন বড় মানুষকে তুলে দেব, আমাকে তোমরা কি দেবে? সুতরাং এসব জায়গায় নিরাপত্তার কথা ভেবে একমাত্র মেহের অথবা যেখানে যেটুকু সংগঠন আছে তার উপরই নির্ভর করা ভাল। কামাল ওদের কেন্দ্রবিন্দু। সে চারপাশের অঞ্চলে লড়াইটা চালাচ্ছে। সে তারপর কি ভাবে কি করবে কেউ জানে না। এবং এ-বছর হয়তো সব দখল হয়ে যাবে, কিংবা অসংখ্য মৃত্যু। এবং নদীর চরে হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহ সে পিছনে ফেলে এসেছে—প্রায় শ্মশানের সামিল। আগামী কাল

কাক প্রাণী নদীর চরে যারাই আসবে দেখবে অসংখ্য মানুষ নিহত। নিরপরাধ নীরিহ মানুষেরা নদীর চরে আসমানের দিকে হা আল্লা হা ঈশ্বর করে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সে এবার বলল, রাতে ভাত খাব না মিনু। নাঙ্গলবন্দ থেকে কতদূর গোয়ালন্দি মিনুর জানার কথা নয়। মিনুর ধারণা, নদীর পারেই গ্রাম, অথবা কিছু পথ হেঁটে গেলেই মেহেরের বাড়ি। এবং সেখানে পৌঁছে গেলেই যেন সমসেরের সব কাজ সারা। সে ইচ্ছা করেই মিনুকে আর দূরত্বের কথা বলে চিন্তিত করতে চাইল না। অথবা এই যে মিনু যাচ্ছে আরও বড় দায়িত্ব নিয়ে, হয়তো মিনু টেরই পাচ্ছে না দায়িত্বটা কত বড়, বাক্সটাতে কি আছে, এবার এটাও ভাল করে বলা দরকার এই ভেবে সে একটা লিস্ট বের করে দিলীপের হাতে দিল।

এখানে আর দূরের যে আগুন গ্রামের মাথায় উঠে গেছে তা দেখা যাচ্ছে না। কেবল মাঝে মাঝে আগুনের হলকা এবং ধেঁায়ার কুণ্ডলি আকাশে উঠে গেলে অজস্র বাঁশ ফাটার অথবা টিনের চাল উড়ে যাবার শব্দ কানে আসছে। আর এখন নৌকার মুখ ঠিক উত্তরের দিকে নয়। কিছুটা উত্তর-পূর্ব কোণে। ফলে আগুনের যে আলোটুকু এই নৌকায় আসা দরকার অথবা আসতে পারলে সুবিধা হত, তা আসছে না। ওরা টর্চ না জ্বালিয়ে পড়ে নিতে পারত তবে। কিন্তু এখন উত্তর-পূবমুখী নৌকার মুখ, গলুইতে সে বসে রয়েছে। ওর পা জলে ভিজে গেছে। কারণ মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঢেউ এসে ওর চারপাশে জলের ঘুর্নি সৃষ্টি করছে। নৌকাটা জল কেটে বেশ দ্রুত যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছিল প্রায় দ্রুতবেগে এই অঞ্চল পার হয়ে যাবার চেষ্টা করছে আমিনুল। মাঝে মাঝে কোন বনজঙ্গলে শনের দড়ি আটকে গেলে ওরা লগি দিয়ে তা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। এবং সেই সময় একটা সাদা পাতায় কামালের হস্তাক্ষর। সব উৎসর্গীকৃত প্রাণদের উদ্দেশ্য করে লেখা—সংগ্রাম আমাদের কবে শেষ হবে জানি না। কি ভাবে শেষ করব তাও জানি না। আমি

তোমাদের কোন মোহের ভিতর টেনে না নিয়ে শুধু বলতে চাই, আমি অথবা আমরা যে যেভাবে পারব সংগ্রাম করে যাব। এই দুঃসময়ে কোন সংগঠনে যাবার আমাদের বড় কোন পথ নেই। কেউ কেউ দিশেহারা হয়ে গেছে। যারা আমাদের পাশে থাকবে ভেবেছিলাম, এই মৃত্যু এবং ধ্বংসলীলা দেখে তারা স্থবির হয়ে গেছে। কেউ কেউ জানি পাগল হয়ে যাবে। তোমরা জান ময়নাকে। ময়নার স্বামীকে ওর সামনে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। ওকে উলঙ্গ করে দিয়েছিল। বেয়নেটের খোঁচা মেরেছে। পিঠে ওর বেয়নেট দিয়ে কেটে কেটে মাংসের ভিতর জালিমশাহির বর্বর ইতরেরা লিখেছে—পাকিস্তান। ওর পিঠে মাংসের ঘা শুকিয়ে গেলে, সে জীবনে কোনদিন এই দাগ তুলতে পারবে না। এবং উলঙ্গ করে—ওর যৌবন ওরা নানা ভাবে···আমি এসব কথা আর লিখতে পারছি না। ওকে মেহেরের কাছে পাঠিয়েছি। সে এখন সুস্থ আছে। এভাবে শুধু তোমাদের আমি সাহস দিতে পারি, অত্যাচার যত বাড়বে, আমাদের বাহিনী তত শক্ত হবে। ময়না এখন কি যে সাহসী, সে এখন আমাদের বড় অ্যাসেট। সে মাঝে মাঝে পাগলের মত বলে ওঠে, রাইফেল কাঁধে ফেলে আমরা কবে ঢাকার দিকে মার্চ করে যাব? ওর মুখ দেখলে আমি ভীষণ সাহস পাই। ওকে দেখলে তোমরাও পাবে। ওর মত অসংখ্য ময়েরাও আজ তোমাদের পাশে। তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে সব সময় মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকবে। এইটুকু লিখে সে একটা লম্বা টান দিয়ে চিঠিটা শেষ করেছে। উপরে লিখেছে আমার বন্ধুগণ, নিচে লিখেছে, বাংলাদেশের একজন দীনতম সন্তান কামাল ইব্রাহিম। তারপর লিখেছে—বিঃ দ্রঃ একটা ফিরিস্তি—পি থ্রি-ফোরটিন ম্যাগাজিন রাইফেল—বারোটা। হাত গ্রেনেড বাইশটা, দুশো তেরো রাউণ্ড গুলি, সে তেরো কেটে ফের চোদ্দ করে দিয়েছে। তারপর লিখেছে, জয় বাংলা।

সাদা পাতাটা সমসের পাটাতনে বিছিয়ে রেখেছিল। দিলীপ হালে

বসে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। সমসের টর্চ জ্বালিয়ে রেখেছে। আবুল যেমন মা-বাবার মাঝখানে মুখ বার করে রেখেছিল, তেমনি রেখেছে। সে চিঠিটা পড়তে পারছে না। কারণ চিঠিটা উল্টো করে রাখা। দিলীপচাচা যাতে ভালভাবে পড়তে পারে সেজন্য তার আব্বা চিঠিটা গুলইয়ের দিকে রেখেছে। দিলীপ চিঠিটা পড়তে পড়তেই কেমন দুহাত তুলে চেঁচাল—জয় বাংলা। এই চিঠি, এমন চিঠিই এ-সময় সবাইকে সাহস দেবে। কি সাধারণ ভাবে লেখা চিঠি, অথচ কত যত্ন নিয়ে লিখেছে। সে এই চিঠি পড়তে পড়তে বার বার মুখ তুলে সমসেরকে দেখছে। কখনও আবুলকে, মিনুবৌদিকে। চিঠিটা ওদেরও সাহস যোগাচ্ছে। সমসেরকে না নামিয়ে দিতে পারলে সে এখন আর শান্তি পাচ্ছে না। গোপনে ঠিক আছে সমসেরই লোক পাঠিয়ে এই বাক্সটা ঝোপের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে যাবে। তাকে মানুষজন ঠিক করে সব করতে হবে। এতটা পথ সে একা একা চলে এসেছে। নৌকায় সময় লেগে যায়। সাইকেলে কম সময় লাগে। সে বন্দর পার হয়ে যদি সাইকেলে উদ্ধবগঞ্জ হয়ে অথবা মোগরাপাড়ার ভিতর দিয়ে গোয়ালদি যেত, অনেক কম সময় লাগত তার। অথচ এখন সে সমসেরকে কিছু বলতে পারছে না। ওর নিজেরও কেমন কষ্ট হচ্ছিল। এই যে সামনে নদীর দুপারে সব মিলিটারি ছাউনি আছে, এবং নদীর পাড়ে গাছের নিচে সব খানেরা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কঠিন চোখের কথা ভাবলে সে-ও কেমন বিচলিত বোধ করছে। অথবা সেই অন্ধকার রাত্রি এবং সে আর তার বোন, কি যে সে দেখতে পেয়েছিল, এখন আর কিছুতেই মনে করতে পারছে না। কেবল চিৎকার ভেসে আসছিল, দাদা রে—সে আর কিছু শুনতে পায় নি। আগুন আর বীভৎস ধর্ষণে যুবতী নারীর মুখ দেখে দেখে সে আকুল হয়ে গিয়েছিল। আগুনের ভিতর দিয়ে সে ছুটছিল, চারপাশে আগুন। হাত বাঁধা। তাকে অন্ধকারে কারা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সে কান্নার শব্দ দ্রুত পার হয়ে যাবার জন্য অথবা মার্চ পাস্টের

মত দৃশ্য, কখনও মনে হয়েছে দেয়ালে দাঁড় করানো শরীর তার, এবং বুলেটে সে এবার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। তবু তার মাঝে ঘরের ভিতর সেই চিৎকারটা—দাদা রে…। আর কিছু না। একটা শব্দ—দাদা রে! সে মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে ছুটে আগুনের ভিতর ঝাঁপ দিয়েছিল। এবং সেই সব উর্দিপরা নিষ্ঠুর চোখে-মুখে কি বীভৎস উল্লাস! ও-বেটা হালা হারামজাদা বঙাল অগুনে পুড়ে মরবে। ওরা ভাঙা ভাঙা বাংলায় উল্লাস করছিল। বুলেট খরচ করেনি। দিলীপ আগুনের ভিতর দ্রুত ছুটে গিয়েছিল, এবং দুপাশের চালাঘরে আর নর্দামার ভিতর যে সামান্য ঠাণ্ডা আশ্রয় রয়েছে ও-পাশ থেকে ওরা কেউ টের পায় নি। সে তখনও সেই কান্না যেন শুনতে পাচ্ছে—দাদা রে! সে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে নদীতে এসে ঝাঁপ দিয়েছিল।

জলে সাঁতার কাটার সময় মনে হল জেটির উপর কারা বসে রয়েছে। সে জলে ডুব দিয়ে খুব কাছে চলে গেল। কাঠের পাটাতনটা উপরে। নিচে লম্বা খুঁটি। জলের অনেক নিচে চলে গেছে। অল্প জ্যোৎস্না বলে পাটাতনের নিচটা একটা অস্পষ্ট ছায়া সৃষ্টি করে রেখেছিল। তার ভিতরে সে ডুব দিয়ে ভেসে উঠতেই শুনল, জেটির ওপরে ওরা বসে গান গাইছে।

যখন আগুন জ্বলছিল এবং ধর্ষণ চলছিল, অথবা বুলেটের ঘায়ে সব তাজা প্রাণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে এবং যখন—দাদা রে, আর কোন শব্দ নয়, দাদা রে—এক শব্দ শুধু ওকে পাগল করে দিচ্ছে, তখন এ-পারে বসে কিছু উর্দুভাষী মানুষ উল্লাসে হাতে তালি বাজাচ্ছে। সে শুধু ওদের গান শুনতে পাচ্ছিল, ও-পারে যে আগুন এবং ধর্ষিতা প্রাণের কণ্ঠ আবেগে আকাশ-বাতাস মথিত করছে, এপারে ওরা বসে বসে গান গেয়ে নানা রকম উল্লাসে তা ঢেকে দিচ্ছিল।

পুরানো জেটি এবং ভাঙা। খুঁটিগুলি দীর্ঘদিনের অযত্নে নড়বড়ে। অব্যবহৃত এই জেটি। এখানে কেউ কেউ সুসময়ে বসে থাকত, নদীর হাওয়া খেত। এই জেটিতে দিলীপ ছোটবয়সে আসত। ওরা পা টিপে টিপে জেটির কাঠে যে রেলিং আছে তার উপর হেঁটে যেত। তখন

থেকেই জেটিটা পরিত্যক্ত। ছোট ছোট জাহাজ ভিড়বার জন্য আলাদা শক্ত এবং সুন্দর জেটি তৈরি হয়েছিল ও-পাশটায়। উপরে ওঠার মুখে সিঁড়ি। এবং ঘাটের মত। দুধারে মানুষ বসতে পারে—এভাবে শান বাঁধিয়ে ঘাট. এবং কিছু পাম গাছ, গাছের নিচে সুখী মানুষেরা বড় বড় সাদা রঙের ছাতা মাথায় এসে বসত। সামনে নদীর জল। ও-পারের কল-কারখানা, অফিস-আদালতের ভিড়টা এ-পারে একেবারে ছিল না। সে রুমিকে নিয়ে কোথায় চলে যেত। এবং 'দাদা রে' এই এক শব্দ ওকে ভিতরে ভিতরে পাগল করে দিয়েছে। সে নিজের ভিতরেই এক আশ্চর্য মানুষকে খুঁজে পেয়েছে তখন। মহাশক্তি অথবা এক অমিত তেজে সে নড়বড়ে খুঁটি থেকে একটা খুঁটিকে আল্‌গা করে দিতে পারলে, দিতে পারলেই, জেটি জলের ভিতর নেমে যাবে। ওর হাতে কিছু ছিল না। সে কাঠে কাঁধ লাগিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে যখনই ওরা জোরে গান গেয়ে তালি বাজাচ্ছিল, সে অমিত তেজে সব উল্টে পাল্টে দিল। এবং ধপাস, হুড়মুড়, কাঠের পাটাতন ভাঙার শব্দ, পর পর নদীর জলে। ওরা তো সাঁতার জানে না। একটা মানুষ কোনরকমে খুঁটি ধরে বাঁচার চেষ্টা করছিল, সে তাকে টেনে হিঁচড়ে কাঠ ছাড়িয়ে, আরে এ যে সব খান, কাঁধে রাইফেল, ওরা ওখানে পাহারায় ছিল! সব ক'টা ডুবে যাচ্ছে। আহা চাঁদের আলো মায়াময়। জলের ভিতর মাঝে মাঝে আপ্রাণ ভেসে ওঠার চেষ্টা করে আবার ডুবে যাচ্ছে। পিঠে হ্যাভারস্যাক। এবং কাঁধে রাইফেল। ওরা জলের নিচে ডুবে যাচ্ছিল, শুধু একজন ডুবে যাচ্ছে না। সে তাকে চুলে ধরে একবার জলের নিচে ডুবিয়ে দিচ্ছে এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে এলে আবার তুলে বলছে, ক'জন তোমরা, কে তোমরা? কোন রেজিমেণ্টের? তোমাদের রাইফেলগুলো কি জাতের, ক'জন এখানে ছিলে তোমরা? তোমাদের ক'টা রাইফেল? অর্থাৎ হাতের কাছের মানুষটাকে সে মৃত্যুভয়ের ভিতর ফেলে সব খবর নিয়ে তারপর যেমন খুশি মেরে ফেলে, যেন কত সহজে জলের ভিতর তার হাতে

মানুষটা প্রাণের ভিক্ষা চায়, কিন্তু সেই এক শব্দ—দাদারে ··সেই এক শব্দ আবার—দাদারে · সে কানে আঙুল দিয়েও শব্দটা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। মৃত মানুষটাকে টেনে টেনে জলে ডাঙায় ফেলে রেখে সে ডুব দিল—সেই শব্দ—দাদারে। সেই ভয় থেকেই, অর্থাৎ কানে যেন শব্দটা না আসে, মেয়েটাব ফ্রক গায়ে দেয়া মুখ, সবুজ এবং অবুঝ মেয়েটার বড় বড় চোখ, এখন সে কেমন আছে, যেন সর্বত্র, এই যে নদী জল মাঠ সর্বত্র তার প্রশ্ন, আমাব বোনটা কেমন আছে? কমি তুই ভয় পাস না। তোকে ওরা কি করছে আমি টের পাই। নদীর অতলে ডুব দিলে টের পাই। সে ডুবে ডুবে সেই সব মানুষ ক'টাকে জলের তলায় খুঁজছে। পেলেই সে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলে ডাঙায়। মানুষ-জন নির্জীব, কেউ বের হচ্ছে না। প্রথম রাতেব এই বীভৎস ঘটনায় কাক-পক্ষী পর্যন্ত সাড়া-শব্দ দিচ্ছে না। সে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর শরীর থেকে সব খুলে ফেলছে। খাঁকি উর্দি, পায়ের জুতো-মোজা, বেল্ট এবং রাইফেলেব ম্যাগজিনে যে গুলি পোরা আছে, সে সেফটি অফ্ করে সব খুলে একপাশে সাজিয়ে রাখল। তারপর সারি সারি মৃতদেহ। সে দেহগুলোকে গুণে গুণে নদীব পাড়ে এবং চারপাশে চরে যেসব উপুড় করা নৌকা ছিল তাব ভিতর ফেলে দিয়ে একটা নৌকায় সব তুলে নিল, তাবপব কামালের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়া। সে নদীতে নৌকা বাইছিল একেবারে পাকা মাঝির মত। সে ধরা না পড়ার ভয়ে গান গাইছিল, আমার মাইয়াডা, পোলাডা মামুর বাড়ি যামু কয়·· সেই থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মত এ-ভাবেই দিলীপের দিনগুলো কাটছে। কামালের চিঠিটা পড়তে পড়তে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনা ওর চোখের উপর ভেসে গেল। সে সমসেরকে এবাব বলল, ইবারে আমরা আইসা পড়লাম সমসের। তুই এহানে নাইমা যা।

সমসের তাকাল দিলীপের দিকে। সে তার স্ত্রীর দিকে তাকাল না, ছেলের দিকে তাকাল না। ভাঙা সিঁড়িতে সে পা রেখে ধীরে ধীরে নেমে যেতে থাকল।

চার

সমসের একটা এখন বাঁশের মাচার উপর বসে রয়েছে। শরীরে জ্বরটা বাড়ছে। শীত শীত আর করছে না। ওর যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, কিছুতেই সে মিনু অথবা দিলীপকে বলেনি। বললে হয়তো মিনু আরও দুর্বল হয়ে পড়ত। দিলীপ অথবা আমিনুল ভাবত সে ভয় পেয়েছে। সে সব সময় শক্ত থেকেছে। এমন কি সিঁড়ি দিয়ে পাড়ে ওঠার সময়ও পিছনে তাকায়নি। সে পেছনে ফেলে এসেছে যাদের তারা বুঝি ওর কেউ নয়। তারা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। সে যেমন নিজেকে একমাত্র এখন বাংলাদেশের মানুষ বলে ভাববার চেষ্টা করছে। সে নানা ভাবে এটা ভাববার চেষ্টা করছে। সে অনেক দূর ঝোঁকের মাথায় হেঁটে এসেছে। একবার পিছনে তাকায়নি। তাকালেই যেন দেখতে পাবে আবুলের হাত ধরে মিনু দাঁড়িয়ে আছে। আবুল সমসেরকে ডাকছে হাত তুলে, বাবা তুমি যে যাবে বলেছিলে? আমাকে নিয়ে আম্মাকে নিয়ে শিমূলের বনে যাবে বলেছিলে? কোথায় যে একটা শিমূলের বন অথবা পলাশের বন আছে, ওর কেন জানি কোন বনের কথা মনে হলেই শিমূল অথবা পলাশের কথা মনে হয়। থোকা থোকা লাল ফুল। লাল ফুল আর নীল আকাশ, সূর্য নদীর পাড়ে ডুবে যাচ্ছে। সে, আবুল, ওর মা, সবাই সে বনের ভিতর যেন লুকোচুরি খেলছে। সে হাত বাড়ালেই ওদের আর নাগাল পাচ্ছে না। একটু বেশি সময় ওদের না দেখলে সে আকুল হয়ে ডাকছে, আবুল, মিনু তোমরা কাছে না থাকলে আমি সাহস পাই না। তোমরা এ-ভাবে লুকিয়ে পড়ে আমাকে ভয় দেখাবে না।

পিছনে তাকালেই এখন যেন বড় একটা শিমূলের বন দেখতে পাবে। গাছের গুঁড়িতে মুখ অদৃশ্য করে গোপনে মা আর ছেলে বাপ মানুষটাকে দেখছে। ভারি মজা পাচ্ছে ওরা। চোখ দুষ্টুমিতে ভরা।

ওরা দুজনেই দেখছে সমসেরের আকুল চোখ। সে ধরা পড়ে যাবে এমন ভাবতেই আরও জোরে হেঁটেছে। ওরা ওকে দুর্বল করে দিচ্ছে বড়। সে প্রায় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটছে। সে নিজের উপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। শক্ত শক্ত পা ফেলে যেন সে এই অন্ধকার ভেঙে আকাশের নক্ষত্র গুণতে গুণতে এখন মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। কে বলবে এখন, সমসের যাচ্ছে, সমসের এক মানুষ, যার ভালবাসার মিনু, নাবালক ছেলে আবুল যুদ্ধক্ষেত্রে এবং সে এখন একা এক মাঠে নিঃসঙ্গ মানুষের মত দুহাত উপরে তুলে বলছে, আল্লা তুমি আমার আশৈশবে ছিলে, এখনও আছ। তোমার অদৃশ্য হাত আমার চারপাশে। আমার চারপাশে যা কিছু আছে, এই মাঠ নদী, বাংলাদেশে, সবই আমার কাছে মিনুর দুই চোখে ভাসে। আমি ওর চোখ ছুঁলে টের পাই সব। তোমাকে অনুভব করি। এখন আমি তাদের ভাসিয়ে দিয়ে সূর্য ধরতে যাচ্ছি।

সে এসব ভেবেই নিজের ভিতর সাহস সঞ্চয় করছিল। সে অন্ধকার মাঠে এসে কোন পথটা গোয়ালদি গেছে খুঁজে খুঁজে দেখছে এখন। যখন পথ খুঁজে পাচ্ছে অথবা ভুল করছে, তখন সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এত নিঝুম হয়ে আছে সব এবং কোথাও সে একটা লণ্ঠন পর্যন্ত জ্বলতে দেখছে না। সে অনেক দিন এই গ্রাম-বাংলার মাঠে আসেনি। সে এ-সব পথ ঠিক চেনেও না। সে শুধু জানে পূবদিকে হাঁটলেই গ্রামটা পাবে। গ্রামটা যে গোয়ালদি সে টের পাবে, একটা বড় অশ্বত্থগাছের নিচে কুটিরে কিছু মানুষজন জেগে থাকবে। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সজনে ফুল বললেই ওরা ওকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাবে। এবং পথের শেষে যদি কোন আর পথ না থাকে, তখনই যত ভয়। সে দাঁড়িয়ে পড়ছে। থমকে পড়ছে। কেউ ডাকছে পিছনে মনে হলেই ছুটছে। ছুটতে ছুটতে একটা ছোট্ট ঝাঁপ [illegible]ত দেখতে পেল। বাঁশের মাচা দেখতে পেল। গ্রামের শেষে এই ছোট্ট চায়ের দোকান। নিভু নিভু আলো জ্বলছে। কুপির আলো। ওর ভীষণ জল-তেষ্টা

পেয়েছে, দাড়ি সে তিন-চারদিন থেকে না কামিয়ে রেখেছে। ফলে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বড় উত্তেজনা গেছে। রাতে ঘুমাতে পারছে না। কি যে হবে! লোকটা ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখে এবং চোখ-মুখের এমন অবস্থা দেখে ঠিক ভেবে ফেলতে পারে শহর থেকে তাড়া-খাওয়া মানুষ। শহর থেকে তাড়া-খাওয়া মানুষ দেখলেই সে নানাভাবে তাকে প্রশ্ন করবে—শহরে আমাগো মানুষেরা মিঞা লড়তাছে ক্যামন? মিঞা মনে লয় আম্রিঅ যাই। বলে হয়তো সে তাকে বলবে, কি লাগব কন? দিত্যাছি। পয়সা লাগব না।

আবার এও মনে হয়, গ্রামটাতে সেই সব মানুষেরা থাকে, শোষণের নামে নিজেদের বাংলাদেশের মানুষ ভাবছে না। কত রকমের মানুষ যে গজিয়ে উঠছে। সে সবাইকে এখন ঠিক চিনতে পারছে না। ফলে সর্বত্র তাকে খুব সাবধানে চলা-ফেরা করতে হচ্ছে। সে ইচ্ছা করলেই আঁজলা পেতে পানি চাইতে পারে না। তবু সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দোকানীকে দেখছিল। কেউ নেই দোকানীর কাছে। সে এবার ঝাঁপ বন্ধ করবে। দিন-কাল খারাপ যাচ্ছে বলে লোকজন রাতে চলাফেরা বন্ধ করে দিচ্ছে। কখন ওরা একটা গ্রামকে ভেবে ফেলবে—ওটা মুক্তি-যোদ্ধাদের গ্রাম। সুতরাং জ্বালিয়ে দাও। যারাই পালাতে চেষ্টা করবে, বুলেটে বিদ্ধ করো। নিরিবিলি সংসার করে কায়ক্লেশে দিনযাপন যাদের, তারা কেউ কেউ উটকো ঝামেলা ভেবে আগু পিছু ঠিক করতে পারছে না। সমসের দোকানীর মুখ দেখে কোন জাতের মানুষ প্রথম টের পাবার চেষ্টা করল। তেষ্টায় বুক ফাটছে। চোখ জ্বলছে। একটু পানি না খেলে সে মরে যাবে। ছাতি ফেটে মরে যাবে। শুধু কাছে যাবার আগে অন্ধকারে একটু দেখে নিল। তার পর কাছে গিয়ে ছায়ার মত দাঁড়াতেই দোকানী বলল, কেডা?

সে বলল, পানি আছে মিঞা? পানির তেষ্টাতে বুক ফাটে।

লোকটা ওকে মুখ তুলে দেখল না পর্যন্ত। পানি চায় মানুষটা।

পানি যে চায় তাকে আর কোন প্রশ্ন করতে নাই। সমসেরকে সে বলল, ব'ন। পানি আনতাছি। বোধ হয় এটা কোন এগ্রিকালচারাল অফিসের বাংলো। দোকানী বোধ হয় বাংলোর দারোয়ান। শহর থেকে সাহেবরা এলে সে তদারক করে। এখন বাংলোতে কেউ নেই। অন্ধকারে শুধু জোনাকিপোকা জ্বলছে। কিছু কীট-পতঙ্গের আওয়াজ। লোকটা বোধ হয় এই মাঠের ভিতর বিলের পাশে সংসারও করেছে। কারণ এতক্ষণে সমসের বুঝতে পারল এটা গ্রামের শেষ নয়। বরং বলা চলে বড় বিলে যাবার পথে এটা প্রবাসের মত বাড়ি-ঘর। একটা কুকুর ডাকছে। পানির জন্য সে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটার আর একটা ঘর ঠিক দোকানের পিছনে। এবং দুটো পেঁপেগাছ বাড়িটার মাথায়। কিছু কলাগাছ আর ফিসফিস কথা।

সমসেরের মনে হল এটা সে ঠিক করেনি। ভিতরে ফিসফিস করে কেউ কথা বললেই সে ভয় পায়। দুজন একজন অথবা দশজন মানুষকে সে ভয় পায় না। ওরা তার কিছু কেউ করতে পারবে না। কারণ সে ইচ্ছা করলে একটা বড় দলকে কালো জীবের মুখ দেখিয়ে আটকে দিতে পারে। সে মৃত্যুর জন্য ভয় পায় না। অযথা ঝামেলা বাধানো এ সময় একেবারেই উচিত নয়। সে আর একটু কষ্ট করে এগিয়ে গেলেই পারত। বেশি দূর হলে আর ক্রোশখানেকের মত পথ। সে এখন কি করবে ঠিক করতে পারছে না।

লোকটা এল এক বদনা জল নিয়ে। হাতে মাটির সরা। সরাতে মুড়ি-গুড়। সে এসেই সমসেরকে বলল, ব'ন। খালি পেটে পানি খাইতে নাই। মুড়ি খান। মুড়ি-গুড় খান।

এমন যে মানুষ তাকে অবিশ্বাস করতে নেই। কেন যে মনের ভিতর এখন অপরিচিত মানুষ দেখলেই ভয়। সমসের বলল, কিছু খামু না। সমসের ঐ মানুষটার ভাষায় কথা বলছে। সে এখানে থেকে সব শিখে ফেলেছে।

—কি যে কন!

যেন এমন হয় না। হতে নেই। হলে খারাপ। হলে সে সংসারী মানুষ, সংসারী মানুষের অমঙ্গল হবে। পানি চাইলে খালি পানি দিতে নাই। দিলে খারাপ। দিলে গুনা। সে বলল, না খাইলে আমার গুনা হইব সাব।

মানুষটা ঠিক টের পেয়ে গেছে—ওরা সেই মানুষ, যারা এখন বাংলাদেশের হয়ে যুদ্ধ করছে।

সে বলল, আপনে খান। ডর নাই। আমি আছি, আমার বিবি আছে, আর আছে একটা হাসুয়া। খানেরা নাই।

সে পানি খেল। দুঃখ পাবে বলে সমসের তাড়াতাড়ি মুড়িটাও খেয়ে ফেলল।

সমসেরকে সে প্রশ্ন করল, এত রাইতে কই যাইবেন?

সমসের উত্তর করল না। বাঁশের মাচায় বসে থাকতে তার ভাল লাগছে। হাঁটতে গেলেই মনে হচ্ছে কপালটা ছিঁড়ে পড়ছে। মাথাটা ভারি। জল খেয়ে সে বল পেয়েছে। ওরা এখন খাঁড়ি নদীর মুখে। মুখের দু পাড়ে মিলিটারি বেস আছে। প্রত্যেকটা নৌকাই ফাঁড়ির মুখে তারা চেক করবে। প্রথম বিপদের মুখে ওরা কি ভাবে যে পার হবে! সমসেরের কেবল সেই নৌকা, নৌকায় মিন্নুর মুখ, আবুলের অর্থহীন বোকা বোকা চোখ এবং দিলীপের শক্তসমর্থ চেহারার কথা মনে হচ্ছে। ওরা শেষ পর্যন্ত না পারলে রূপগঞ্জ থানা, আড়াই হাজার থানা এবং দক্ষিণে বৈদ্যের বাজার থানার কোনটা ওরা দখল করতে পারবে না।

সমসেরকে বড় চিন্তিত দেখাল। সে আর বসে থাকতে পারছে না। বসে থাকলেই কুঁড়েমিতে তাকে পেয়ে বসছে। সে এবার উঠে দাঁড়াল। পাশের মানুষটা তাকে যেন এখন কিছু বলতে চায়। সে কি বলবে তাও তার যেন জানা। সে বলবে, এই রাইতে আর কোন খানে যাইবেন? এইখানে থাইকা গেলে ভাল হয়।

সমসের এবার ওকে বলল, কোন গণ্ডগোল হয়েছে এদিকে?

—হইব মনে লয়।

আর কোন প্রশ্ন করতে তার সাহসে কুলাল না। সে এবার মাঠের দিকে হাঁটতে থাকল।

লোকটা তখন সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সে বলল, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ?

—একটু আওগাইয়া দেই।

—না না, আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।

তখন লোকটা বলল, সজনে ফুল।

সমসের ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। ওর আগের ব্যবহার এবং এখনকার ব্যবহারে কত তফাত। সে বলল, সজনে ফুল।

লোকটা এবার বলল, এডা সোজা পথ না। আর পথটা ভাল না। আমার লগে আসেন। ঠিক পথে নিয়া যাই।

—বাড়িতে বলে এলে না?

—আপনের দেরি হয়ে গেল। এত দেরি দেইখা ঝাঁপ বন্ধ করমু ভাবছি, আর দেখি তখন আপনে।

—ওদের সঙ্গে দামগড় পর্যন্ত গেছি। সেখান থেকে হেঁটে আসছি।

—আপনার সাইকেলে আসার কথা···

—সাইকেলে আসা গেল না। বন্দরের মুখে ওরা পল্টন সাজিয়ে বসে আছে।

সমসের হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমাকে এখানে কে রেখেছে?

—আমার বাস এহানে। মোড়ে মোড়ে আপনের লাইগা মানুষজন আছে আমাগো।

সমসের বুঝল, ওদের সাবধানতার শেষ নেই। ওর পোষাক এবং মুখ আর চশমা এবং সরু গোঁফ, চুল ছোট করে ছাঁটা, পাজামা, পাঞ্জাবি সব মিলে যেন সে তাদের কাছে একটা ছবি হয়ে আছে। সে যেখানে যে-ভাবে থাকুক, ওরা ঠিক চিনে ফেলবে। যেখানে যে-কোন বিপদে পড়ুক, দেখতে পাবে সে, চারপাশ

থেকে সবাই ছুটে এসে ওকে রক্ষা করছে। সে যদি এ-ভাবে নৌকার চারপাশে এমন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করতে পারত! কি ভেবে সমসের এবার সজনে ফুলকে বলল, তুমি যাও। আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।

সজনে ফুল বলল, আমাগো কাছে নির্দেশ আছে, আপনেরে পাইলেই নিয়া যামু।

সমসের এবং সজনে ফুল এখন একটা উঁচু ঢিবিতে উঠে যাচ্ছে। তারপর ছোট্ট একটা খাল এবং বাঁশের সাঁকো। আম জাম গাছের ঘন একটা অন্ধকার ওপারে। সে সেই ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি অনর্থক কষ্ট করছ।

সে বলল, কষ্ট কইরা ছাখি পার পাই কিনা!

সমসের আর কিছু বলল না। আম জাম গাছের অন্ধকারে সরু পায়ে-হাঁটা পথে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর তখন সেই খাঁড়ির মুখে, দুই তীর খানেরা পাহারা দিচ্ছে। খাঁড়ির মুখে সব নৌকা এখন বন্ধ করে দিয়েছে। অথবা পাড় থেকে সার্চলাইট জ্বেলে যা-কিছু নদীতে দেখছে, এমন কি একটা মরা গরু ভেসে গেলেও ওরা বুলেটে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। কিছু নৌকা ফিরে যাচ্ছিল, অথবা কিছু নৌকা ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে জল ভেঙে সোয়ারিরা হাঁটা-পথে মাঠের দিকে নেমে যাচ্ছে। আমিনুল অন্ধকারেই টের পেল, আর একটু এগুলেই সেই আলোর মুখে পড়ে যাবে। খাঁড়ির মুখে কাল পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে কোন আলো ফেলার ব্যবস্থা ছিল না। খানেরা টের পেয়ে গেছে এই পথে কাল থেকে ঘাসি অথবা গহনা নৌকায় আর্মস পাচার হচ্ছে।

ঘাসি অথবা গহনা নৌকা দেখলেই মর্টার দেগে নৌকা জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ভিতরে কি আছে, যদি সোয়ারি থাকে, সাধারণ ভীতু মানুষ থাকে, তবে গতকাল পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমিনুল নৌকাটাকে

একটা গাছে বেঁধে পাড়ের গ্রাম থেকে এমন খবর নিয়ে যখন পৌঁছল, তখন মিনু ছইয়ের বাইরে। মিনু চারপাশটা দেখছে। দিলীপ, আবুল নদীর চরে দাঁড়িয়ে আছে, কখন আমিনুল খবর নিয়ে আসে। যে সব নৌকা ফিরছিল, ওদের কাছে উড়ো খবরের মত খবর, নৌকা খাঁড়ির মুখে ঢুকতে দিচ্ছে না। মিনু সেই থেকে বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। আমিনুল কি খবর নিয়ে আসে সেই আশায় সে পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমিনুলকে নিয়ে ওরা আসছে। অন্ধকারে এখন দুজন দেখা যাচ্ছে না, তিন জন। চরের বালি মাটি ভেঙে ওরা এসে নামছে। তিনজনের ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতেই মিনু বুঝতে পেরেছিল, আমিনুল খবর নিয়ে ফিরেছে। কি খবর আছে—এই আশায় সে পাটাতন থেকে লাফ দিয়ে হাঁটুজলে নেমে গেল, এবং ওদের কাছে পৌঁছবার জন্য সে প্রায় ছুটে গিয়ে বলল, কিছু খবর পেলে?

দিলীপ এবার ধমক দিল, বৌদি, তোমারে না কইছি, জলে নাইম না! তুমি তো দ্যাখছি আমাগো শেষ পর্যন্ত বিপদে ফ্যালবা।

মিনুর মুখটা ভারি হয়ে গেল। বস্তুত সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, সামান্য নদীর চর ভেঙে নেমে আসতে ওদের যেন কত সময় লেগে যাচ্ছে। সে অধীর হয়ে নেমে এসছে! আর আসতেই ধমক দিলীপবাবুর। সে বলল, আমি আর পারছিলাম না।

দিলীপ কথাটা ধরতে পেরে বলল, এ-সময় অধীর হয়ে কি লাভ বল? দিলীপ যখন গভীর এবং দৃঢ় কথা বলে, তখন ভাল ভাবে বলার চেষ্টা করে। কিছুটা বইয়ের ভাষার মত। সে-ও ইচ্ছা করলে যে মিনুবৌদির মত কথা বলতে পারে এক এক সময় ওর গাম্ভীর্য দেখলে তা টের পাওয়া যায়।

আমিনুল বলল, খুব বিপদ। যাওয়ন যাইব না। খাঁড়ির মুখ বন্ধ কইরা দিছে।

আবুল বলল, কি দিয়ে বন্ধ করেছে চাচা?

—বন্দুক দিয়ে।

—আমাদেরও তো বন্দুক আছে।

একটু জোরে কথা হয়ে যাচ্ছিল বলে, মিনু বলল, আস্তে আবুল।

ওরা কি করবে ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছিল না। এত বড় কাঠের বাক্সটাকে পারে নিয়ে যাওয়া কঠিন। পাড়ে যদিও নিয়ে যাওয়া যায়—তারপর? তারপর কি হবে! এখনও প্রায় সাত ক্রোশের মত পথ: অবশ্য পঞ্চমীঘাটে নামিয়ে দিতে পারলে পাঁচ ক্রোশের মত পথ পার হতে হবে।

দিলীপ আমিনুলের পরামর্শ শুনে বলল, গোটা ব্যাপারটাই অ্যাবসার্ড। প্রথম কথা, যদি পারের গ্রামে সজনে ফুল না থাকে, যদি তোর কথামত লোকজন না পাওয়া যায়, এত বড় কাঠের বাক্স মাথায় করে নিয়ে যাবে কে? দুজন তিনজন লোকের সাধ্য আছে এটা নাড়ায়?

মিনু বলল, তবে কি ভাবে যাবেন? সকাল হতে না হতে আমাদের পৌঁছতেই হবে। সে যেমন করে হোক। বলে সে বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বলে আবার থাবড়ে দিল।

আবুল বলল, মা আমি নৌকা ঠেলে নিয়ে যাব।

নৌকা ঠেলার কথা কানে আসতেই দিলীপের বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল। ছেলেটা না বুঝে-শুনে একটা কথা বলেছে, অথচ আশ্চর্য সেই কথা থেকে কি করে যে সে এমন একটা দুর্লভ বস্তু আবিষ্কার করে ফেলল! সে আনন্দে আবুলকে বুকে তুলে নিল। এবার, এবার আমরা ঠিক পার হয়ে যাব বৌদি। আমিনুল নৌকা ওপারে নিয়ে যাবে। বৌদি আসুন, আর দেরি করবেন না। এখন অনেক কাজ আমাদের।

কেউ ওর অহেতুক আনন্দের অর্থ ধরতে পারল না। প্রায় সে যেন আর্কিমেডিসের সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে আবুলকে কাঁধে নিয়ে আগে আগে বালির চর ভেঙে নৌকায় উঠে গেল।

আর ক্রোশখানেকের পথ। সেই ক্রোশখানেক পথ পার হলেই খাঁড়ির মুখ। মুখের ওপর একটা সাদা আলো বৃত্তাকারে ঘুরছে। প্রায় নদীর মোহনায় অথবা কোন বদ্বীপে কেউ লাইটহাউসে বসে যেন সমুদ্রের তরঙ্গ পাহারা দিচ্ছে।

দিলীপ বলল, ওপারে মিনুবৌদি, আমিনুল, আবুল তোমরা নেমে যাবে। প্রায় আদেশ এটা। এখন সে এই ফ্রন্টের একমাত্র নেতা। ওর কথা কে না শুনবে। যদি সে এমন বলে দেয়, তোমরা তিন জন এই নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দেবে তবেই আমি নৌকাটাকে মরা মানুষ নিয়া ভাইসা যায়, এমন কইর‍্যা নৌকাটাকে জলে ভাসাইয়া দিতে পারমু। খালের মুখে মৃত মানুষের মুখ দেখলে ওরা আঁতকে উঠবে। সেই ফাঁকে আমি নদীর ভিতর নৌকা পার করে নেব। এখন এমন বললেও ওদের যেন রাজী হয়ে যেতে হবে।

সে পারে নৌকা ভিড়লে একটা হাঁসুয়া বের করে নিল। অন্ধকারেই সে গাছপালা চিনে বড় বড় ডাল কেটে ফেলল গাছের। সবই শ্যাওড়াগাছের ডাল। আমিনুল ওর নির্দেশ মত সব গাছের ডালগুলো নিয়ে নৌকার কাছে ঠিক গলুইয়ের মুখে জড় করছে। ওরা কেউ বুঝতে পারছে না কিছু। এই ডালপালা দিয়ে কি হবে? কিছু হিজলের ডালও সে কেটে ফেলল। হিজল ফুলের জন্য, ডালপালাগুলোকে আর ডালপালা মনে হচ্ছে না। সং ফুলের গাছ মনে হচ্ছে।

ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে? মিনু ঘড়ি দেখল। দশটা বেজে গেছে। ওদের কতটুকু পথ আসতেই দশটা বেজে গেল। এইসব গাছপালা কেটে দিলীপবাবু কি যে করছে! কিছু বলছেও না। সে কিছু না বললে মিনুও কিছু বলতে পারছে না। আবুল আমিনুল শুধু নির্দেশ মত কাজ করছে। মিনু বাচ্চাটাকে কাঁধে ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীপ এবার লাফ দিয়ে জলে নেমে পড়ল। নদীর জল কমে

গেছে বলে এখন এখানে বুক-জল। বালি মাটি নিচে, ছুটো একটা ঝিনুক পায়ে লাগছে। এ নদী ঝিনুকের নদী। এইসব পাশাপাশি গ্রামগুলো প্রতিবছর এখানে এই নদীর জলে ঝিনুকের চাষ করে বলে পাড়ে অনেক ঝিনুক স্তূপীকৃত। এবং একটা পচা গন্ধ উঠছে সব সময়। গাদামারা ঝিনুক। ছাই চাপা এবং ছাই দিয়ে ঝিনুক পচিয়ে নিচ্ছে। ছাই দিলেই ঝিনুক পচে গিয়ে হাঁ হয়ে যায়। ভিতরের মাংসটা পচে গেলে খসে যায়। এবং সাদা, কি ধবধবে সাদা ঝিনুক পড়ে থাকে সে সময়। ওকে সন্তর্পণে নৌকাটাকে টেনে একেবারে পাড়ে তুলে দিতে হচ্ছে। অন্ধকারে ঝিনুকে পা পড়লে কেটে যেতে পারে—এবং অহেতুক অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে ভেবে সে আবুল এবং মিনুকে নৌকা থেকে নেমে ছুটোছুটি করতে বারণ করল। সে ডাকল, আমিনুল।

আমিনুল কাছে এলে বলল, তুই নৌকায় উইঠা আয়।

আমিনুল নৌকায় উঠে গেল।

দিলীপ এবার আমিনুলকে বলল, তুই পাটাতনগুলি সব তুইলা আমারে দে।

আমিনুল একটা একটা করে পাটাতন খুলে দিচ্ছে, আর দিলীপ সেগুলো পাড়ে জড় করছে। পাটাতন তোলা শেষ হয়ে গেলে বলল, এবারে ছইটা আয় নামাই।

ওরা দুজনে মিলে ছইটাও নিচে নামিয়ে দিল।

দিলীপ বড় একটা ডাল, ডালটাতে ঝোপ-জঙ্গল আছে অর্থাৎ ডালটা নিবিড় পাতায় ঠাসা, সে ডালটাকে ঠিক নৌকার মাঝখানে পালের খুঁটির মত পুঁতে দিল। তারপর ছইটা এনে রেখে দিল নৌকায় এবং হাতে হাতে নৌকার গলুইতে, পাছাতে এবং মাঝখানে যেখানে যতটা জায়গা আছে ডালপালাগুলি পালের খোঁটার মত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। নৌকার চারপাশটা ঝোপে-জঙ্গলে ঢেকে দিলে সে মিনুবৌদিকে টর্চের আলো জ্বেলে নৌকাটা দেখতে বলল।

মিনু টর্চের আলো জ্বালতেই অবাক। সে নৌকাটাকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না। যেন একটা জঙ্গল রাতারাতি নদীর পাড়ে গজিয়ে উঠেছে। দূর থেকে নদীর কিনারে ভেসে গেলে কেউ টেরই পাবে না এটা একটা নৌকা। নৌকার ভিতরে একটা কাঠের বাক্স আছে। এবং একটা নৌকা ধীরে ধীরে জলের কিনারে কিনারে আসছে। দেখলে মনে হবে একটা ঝোপ প্রাণ পেয়ে গেছে। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। ক্রমে অন্ধকার রাতে নদীর কিনারে কিনারে ভেসে চলেছে।

মিনু এবার সব ধরতে পেরে বলল, তাই বলি। শেষে জলের কাছে নেমে এল। শাড়িটা একটু তুলে পায়ের পাতা জলে ভিজালে ধমক দিল দিলীপ, আপনে আবার জলে নামতাছেন ক্যান ?

—পানিতে নামছি না।

—তবে কি করতাছেন ?

—একটু মাটি তুলে এপাশটা ঢেকে দিচ্ছি।

—ওটা আমি করতে পারব।

মিনু টর্চ জ্বেলে রাখল। ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে নৌকার কাঠ দেখা যাচ্ছে। কাঠ যাতে না বোঝা যায়, কাঠের রং মাটির মত করে দেবার জন্য জল থেকে কাদা তুলে লেপে দিল দিলীপ। টর্চ মেরে মেরে মিনু কাঠ খুঁজছে আর সেখানে মাটির প্রলেপ। এভাবে নিমেষে ছোট্ট একটা বনের সৃষ্টি হয়ে গেলে সহসা মনে হল কুঁচকিতে কি জড়িয়ে ধরেছে। এবং হাত দিতেই সে বুঝল একটা জোঁক রক্ত খেয়ে পটলের মত হয়ে আছে। ছুটে সে জল ভেঙে উপরে উঠে গেল, সে মিনুকে ওর শরীরে টর্চ মারতে বলল। টর্চের আলোয় মিনু, আবুল, আমিনুল দেখল ওর সারা গায়ে জোঁক। আবুল খুব ভয় পেয়ে গেল। মিনু ভয়ে কাছে আসছে না। কেবল আমিনুল টেনে টেনে জোঁকগুলো তুলে ফেলছে।

দিলীপ বলল, এটা একটা ঝামেলা হইয়া গ্যাল।

ঝামেলাই বটে। নদীর জলে সব সময় সাঁতার কাটলে শরীরে

জোঁক বসতে পারবে না। কিন্তু ওকে যে ভাবে যেতে হবে—সে এখন যদি একটু কেরোসিন তেল পেত। সামান্য কেরোসিন তেল শরীরে মেখে নিলে জলের কীট-পতঙ্গের ভয় থাকে না। এখন জলে তেমন জোয়ার খেলে না বলে জল ঘোলা। জলে নানা রকমের মশা-মাছি। এবং উলানি পোকা। সারা শরীর উলানি পোকার কামড়ে ফুলে গেছে।

আমিনুল বলল, তুই অগ লগে যা। নৌকা ভাসাইয়া পানিতে আমি ভাইসা যাই।

দিলীপ লুঙ্গিটা চিপে একটা সিগারেট ধরাল। একটা সিগারেট খেতে পেলেই সে তাজা হয়ে যাবে।

মিনু বলল, আপনি দুপুরে পেট ভরে খান নি দিলীপবাবু। আমিনুলও খায় নি। আপনার ভাইসাব আমাকে আসার সময় কিছু খাবার নিতে বলেছিল। এখন্ যদি খেয়ে নিতেন।

—কি আনছেন ছ্যাখি।

—সেউই ভাজা। সে বাচ্চাটাকে আবুলের কোলে দিয়ে পুঁটলি খুলল।

—গ্র্যাণ্ড, বলে সে বসে পড়ল মাটিতে। ভিজা লুঙ্গিটাই সে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ছ্যান খাই। বাঁচি মরি খাইয়া লই।

এখন আর একজন মানুষ যে কোথায় আছে! সমসেরের কথা মনে আসতেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল মিনু। সে, সব প্রায় দিলীপকেই দিয়ে দিচ্ছিল।

—এটা কি হচ্ছে বৌদি। আবুলকে ছ্যান।

—আমরা তো খেয়ে বের হয়েছি।

—এ হয় নাকি! আবুল আয় রে, তুই আমার লগে খা। আমিনুল বস। পাশে একটা ডালের উপর আমিনুলকে বসতে বলল—অরে ছ্যান।

প্রায় সবটাই সে দিয়ে দিলে দিলীপ বলল, বৌদি আপনের লাইগা কি রাখছেন ছ্যাখি।

মিনু বলল, আছে।

—কি আছে ছ্যাখি।

—বললাম তো আমার জন্য রেখেছি।

দিলীপ এবার না হেসে পারল না।—বৌদি আপনেগো জাতের একটা দোষ আছে।

সহসা মিনুর মুখটা কেমন কালো হয়ে গেল। স্বাধীনতার দিনেও দিলীপবাবু জাত তুলে কথা বলছে।

দিলীপ বলল, মায়রে-অ ছ্যাখি এই, নিজের লাইগা কি থাকল ছ্যাখে না। কেবল পোলাডা মাইয়াডা কইরা সারা জীবন কৃচ্ছ্রসাধন কইরা গ্যাল। মাইয়া জাতটার দোষ অনেক। এডা তার ভিতর অন্যতম।

মিনুর মুখে অদ্ভুত এক দুঃখের হাসি ফুটে উঠল। সে এই মানুষটাকে যে ক'বারই দেখেছে, হাসিখুশী মানুষ। এবং গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন মানুষটা যাবতীয় সুষমা দেখতে পায়। দিলীপ মুখ নিচু করে খাচ্ছে। মিনু দেখতে দেখতে ভাবল। সেই যেদিন ও প্রথম দিলীপবাবুকে নিয়ে আসে, আশ্চর্য—কি লাজুক। কিন্তু সব লজ্জা সমসের ভেঙে দিয়ে বলেছিল, ওকে তুমি একটা গান শুনিয়ে দাও তো। তুমি কত ভাল গাইতে পার ও একবার নিজের কানে শুনে যাক।

—কেন, দিলীপবাবু তোমার কথা বিশ্বাস করে না?

—বললেই বলে, বড্ড বৌর নামে তুই যশ গেয়ে বেড়াস।

খালি গলায় সেদিন সে একটা আশ্চর্য গান গেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি কেন জানি আবার এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে কোরাস গাইতে ইচ্ছা করছে। এখান থেকে ওরা দুটো দল হয়ে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে ওরা যাবে ভৈরবতলার ঘাট পর্যন্ত। দিলীপবাবু ছাউনির সামনে দিয়ে যাবে, আলোর মুখে পড়লে অবশ্য নৌকাটা একটা বন-জঙ্গল মনে হবে। আলোটা ঘুরে ঘুরে এলেই দিলীপবাবু দাঁড়িয়ে পড়বে জলে, অথবা গলা ভাসিয়ে সে ঝোপের

আড়ালে ভেসে থাকবে—না পারলে ধরা পড়ে যাবে এবং বুলেটে ক্ষতবিক্ষত হলে ফসলের মাঠে আর ফের দেখা হবে না। সে ভাবল, এই সময়। এ সময়ে গানটা ওরা সমস্বরে গাইবে।

দিলীপ উঠে দাঁড়াল। বলল, নাঙ্গলবন্দের ভৈরবতলা ঘাট আমিনুল চিনা যাইতে পারবি তো?

আমিনুল বলল, মামুর বাড়ি যাইতে একবার ঘাটে নাও ভিড়াইয়া ইলিশ মাছের ঝোল-ভাত খাইছিলাম।

মিনু বলল, কতদূর হবে?

—ক্রোশ দেড়েকের মত পথ। পথে কোন ভয় নাই। দেখবেন বাড়ি বাড়ি জয় বাংলার পতাকা উড়ছে।

এবার দিলীপ আবুলকে বুকের কাছে এনে বলল, বাইচা থাকলে বাপজানের লগে আবার দেখা হইব। তারপর আমিনুলকে বলল, ভৈরবতলা ঘাটের বড় অর্জুনগাছটার নিচে বইসা থাকবি। অন্ধকারে বুঝতে পারবি না। গাছটার নিচে আইলে আমি সজনে ফুল বইলা হাঁক দিমু। দিলেই টের পাইবি আমি আইসা গ্যাছি।

আর যাবতীয় নির্দেশ, ঠিক একজন বিবেচক সেনাপতির মত সে এখন কাজ করছে। সে এবং আমিনুল ঠেলে নৌকাটাকে ফের জলে নামিয়ে দিল। এবং সে যখন জলে ভেসে যাবে, সে নেমে যাচ্ছিল যখন, তখন মিনু ডাকল। বলল, দাঁড়ান।

দিলীপ মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

মিনু ডাকল, আবুল এস।

আবুল এলে সে আবুলকে দিলীপের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর ডাকল, আমিনুল ভাই।

আমিনুল এলে তাকেও দাঁড় করিয়ে দিল। সেই ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিনগুলির মত। সে তাদের ফল-ইনে দাঁড় করিয়ে দেবার মত ঠিকঠাক করে, নিজে দাঁড়াল সবার শেষে। সে বলল, আমরা একটা কোরাস গাইব। সবাই আমরা গাইব। প্রাণ ঢেলে গাইব।

অন্ধকারে এ-গান যারাই শুনতে পাবে, এই গাছপালা পাখি, নদীর জল এবং দূরে দূরে যে বাংলাদেশের মাঠ আছে—সর্বত্র সবাই এ-গানে জেগে উঠবে। খুব আবেগের সঙ্গে বলায় সময় সময় ভাষারি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

অনেক দূরে টিলার উপর, দুপাড়ে মিলিটারি ছাউনি। ওদের আলোর রেখা আকাশের চারপাশে ঘুরে ঘুরে মরছে। নিচের অন্ধকারে, নদীর খাড়া পাড় বলে বোঝা যাচ্ছে না। নিচে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের মত দাঁড়িয়ে মানুষেরা গাইছে—বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

॥ পাঁচ ॥

সমসের হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মানুষটার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কথা বলছিল। সে যে একজন মুক্তি-যোদ্ধা হয়ে গেছে এবং সজনে ফুল যে তার সমর্থনে এতটা পথ হেঁটে এসেছে, যে-কোন সময়ে মৃত্যুর মুখোমুখি পড়ে যেতে পারে, ওদের কথাবার্তা শুনলে তা আদৌ বোঝা যাচ্ছে না। মিনু এবং আবুলের মুখ ভুলে থাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করছে সমসের। সে বলল, সজনে ফুল, এ-অঞ্চলের নাম তো সোনার গাঁ ?

—হাঁ সাহেব।

—তুমি আমাকে সাহেব বলছ কেন ?

—তা হলে আপনে আমার ভাইজান।

—সজনে ফুল, তুমি খুব ভালমানুষ। তুমি সাদি করেছো কোন সালে ?

—সাদি করছি যেবারে নারায়ণগঞ্জে দাঙ্গা হইল সেবারে।

—তোমার ছেলে-পেলে ?

—এক মাইয়া ভাইজান। বলেই সে বলল, আমরা সোনার গাঁ-র মানুষ। ঈশা খাঁ-র খবর জানেন ভাইজান? সোনাই বিবি ? সোনাইর নামে সোনার গাঁ। মাইয়াডার নাম সোনাই রাখছি।

—একবার দেখালে না ?

—দেখামু কি। ঘুম থাইকা উইঠা পড়লে কার রাখনের ক্ষমতা আছে! আমারে ছাড়তে চাইত না। বলতে বলতে ওরা মাঠ পার হয়ে একটা খালে নেমে গেল। গ্রীষ্মের সময় বলে জমিতে কোন ফসল নেই। জমি চাষ করা। মাটি উল্টে পাল্টে এখন শুধু রোদ খাওয়ানো। জল পড়লেই মাটি ভিজে যাবে। একবার চাষ দিলে সব আগাছা তখন

নষ্ট। জমিতে পাটের চাষ অথবা আউশ ধানের চাষ। মাঝে মাঝে তিলের চাষ সঙ্গে। বৃষ্টি নামলেই এ-অঞ্চলের চেহারা পাল্টে যাবে। এই যে রুক্ষ মাঠ, শুকনো ঘাসপাতা, সব কোথায় যে উড়ে যাবে।

ওরা খালে নেমে দেখল জল নেই। গ্রামে আর এখন কোথাও ওরা আলো জ্বলতে দেখল না। সব অন্ধকার। কেবল মাঠে জোনাকি-পোকা উড়ছে। কিছু কুকুর অথবা শেয়ালের আর্তনাদ। আর মাথার উপর পবিত্র আকাশ। পরিচ্ছন্ন। গরমে ভীষণ ঘাম হচ্ছিল সমসেরের। নাকি ঘাম দিয়ে জ্বরটা সেরে যাচ্ছে—সে ঠিক বুঝতে পারছে না। সে সজনে ফুলকে বলল, এই রাস্তাটা কি তোমার কদমতলির দিকে গেছে?

—না, ভাইজান। রাস্তাটা উইঠা গেছে কিষ্টপুরার দিকে। আমরা গোয়ালদির রামকিষ্ট মিশনের পাশ কাটাইয়া যামু।

—উদ্ধবগঞ্জ থেকে একটা বড় রাস্তা পানামের দিকে গেছে না?

—গ্যাছে। আমরা তার আগেই পাইয়া যামু। অদ্দূরে যামু না।

অর্থাৎ তার আগেই তারা তিন নম্বর কুটির পেয়ে যাবে। এই রাস্তাটা এসেছে গাবতলি থেকে। পানাম স্কুলের কাছে একটা ব্রিজ আছে, সেটা পার হয়ে আমিনপুরের দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। তারপর দুদিকে দুমুখো হয়ে আছে রাস্তা, একটা গেছে দীঘির পারে পারে মাঠের দিকে, অন্য রাস্তাটা গেছে গোয়ালদির কালীবাড়ির পাশ দিয়ে। আর একটু গেলেই সেই তিন নম্বর কুটির। সেখানে তিন চার জন সজনে ফুল থাকবে। এমনিতে সারাদিন ওটা চায়ের দোকান। মেহের দোকান চালায়। সন্ধ্যার পর আর লোকজনের কোন চলাফেরা থাকে না। তখন এটা সামনের দিকে চায়ের এবং পিছনে শেডের পাশে তিন নম্বর কুটির। সামনে লম্ফ জ্বলে। মাথার উপর বড় একটা দেবদারু গাছ। গাছের অন্ধকারে কুটিরটাকে বড় নিরীহ এবং মায়াবী দেখায়। মেহের সেখানে সব মানুষদের

সকাল থেকে গাল-মন্দ করে। রাজনীতি বোঝে না এবং কি যে হচ্ছে এ সব দেশে, এমন একটা ভাব। আর রাত হলেই সে তিন' নম্বর কুটিরের বাসিন্দা হয়ে যায়।

সমসের দূর থেকেই দেবদারু গাছটা দেখতে পাচ্ছে। ঠিক হুবহু সেই ছবি। গাছটা সহসা যেন লম্বা হয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে। কি বড আর লম্বা গাছ! গাছের ঘন ঝোপে-জঙ্গলে সব অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। সামনে সড়ক, সড়ক পার হলে পুকুর এবং পুকুরের পাড়ে সেনেদের পরিত্যক্ত বাড়ি। কিছু খান এসে এ-অঞ্চলে সব পরিত্যক্ত বাড়ি খুঁজে গেছে। যদি সেখানে সজনে ফুলদের কোন আস্তানা থাকে। খুঁজে কিছু পায় নি। মেহেরের দোকানে বসে চা খেয়েছে। ওরা সংখ্যায় দশ জনের একটা দল। সে বোকার মত হাসতে হাসতে কথা বলেছে। সে এমন অভিনয় করেছে যে কে বলবে মেহের সজনে ফুল। যেন মেহের ওদের বান্দা। বান্দার মত উর্দু-বাংলা মিশিয়ে রসের কথাবার্তা, একেবারে সে জমিয়ে দিয়েছিল। তারপর ওরা যখন মাইল তিন পথ পার হয়ে যাবে, দেখতে পাবে, কি অদ্ভুত কায়দায় জাল পাতা আছে। তিন নম্বর কুটির থেকে ওরা কোন পথে ফিরে যাবে নির্দেশ যাচ্ছে। এবং জালের ভিতর পাখির মত দশটা মৃতদেহ কারা নদীর পাড়ে ফেলে রেখে গেছে। ওদের বুকে কোন ক্ষত-চিহ্ন নেই। শ্বাসবন্ধ করে মারা হয়েছে।

এ-সব ভাবতে ভাবতে সমসের কেমন করে যেন যথার্থই মিনু আর আবুলের মুখ ভুলে গেল। ওর এখন সব মানুষের জন্য মায়া হচ্ছে। এমন কি ময়না যে এখন ওদের একজন, এবং সজনে ফুলের গন্ধে সে আর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা একেবারেই ভাবতে পারছে না। ভাবলে কেন জানি খুব ছোট মনে হচ্ছে নিজেকে।

সমসের গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে থেকে উঁকি দিলে কিছু দেখার উপায় নেই। পাটকাঠির বেড়া। পাটকাঠি গোবর দিয়ে

লেপে শক্ত বেড়ার ভিতর এই তিন নং কুটির। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, ভাঙা চাল, গরীব মানুষের দিনযাপনের আস্তানা। ভিতরের দিকটায় একটা তক্তপোষ। তক্তপোষটা সারা দিনমান খালি পড়ে থাকে। উপরে একটা ছেঁড়া সতরঞ্চ। সতরঞ্চটা একপাশে লম্বা হয়ে থাকে। দেখলে মনে হবে অগোছালো মেহের। টেনে কেউ ঠিক-ঠাক করতে গেলে দেখতে পাবে, কিসের সঙ্গে ওটা এঁটে আছে। টানলেও উঠে আসবে না। একপাশে সতরঞ্চটা একটা আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছে। দিনের বেলাতে যারা আসে অথবা রাতে, এখানে একটা হল্ট স্টেশনের মত কাজ সেরে নেয়। এবং গ্রামের ভিতর ময়না, নান্নু, অরুণ, আবেদালি সবার বাড়ি দুর্গের মত। এখান থেকেই চারজন যাবে দন্দির ঘাটে, চারজন যাবে পঞ্চমীঘাটে। যেখানে বাক্সটা থাকবে সেখানে ওরা সারাদিন পাহারায় থাকবে। দেখলে মনে হবে ওদের তখন—ওরা গরীব মানুষ। কাজের জন্য এ-অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বগলে পোঁটলা-পুঁটলি, ছেঁড়া লুঙ্গি, একটা লম্বা বাক্স। বাক্সতে কাচি, পাচন এবং নিড়ানি। উপরে এসব, নিচে তিন নং কুটিরের নির্দেশ।

সে সজনে ফুল বলার আগে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল। অন্ধকারে কেউ ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে। সে তার সঙ্গের সজনে ফুলকে, মুখে আঙুল রেখে, খুব সন্তর্পণে গাছের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়তে নির্দেশ দিল। খালি বাড়িটা ভুতুড়ে মনে হচ্ছে, একটা চিল কি শকুন বাড়িটার ছাদে বসে আর্তনাদ করছে। এই বাড়ির খুব নাম-ডাক ছিল এক সময়। এখনও সদরে দেউড়ি। দেউড়িতে ফুলপরী। ভাঙা হাত-পা। ডানাকাটা পরী দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। পূজা-পার্বণের দিনে ঢাক বাজত, ঢোল বাজত। খুব কান পেতে শুনলে যেন এখনও শোনা যাবে মহিম সেনের গলা ভেসে আসছে। অথবা ঘোড়ার ক্ষুরের ঠকঠক শব্দ। খুব রাত হয়ে যেত মহিম সেনের ফিরতে। সে নারাণগঞ্জের কাছারিতে কাজ সেরে ঘোড়ায়

ফিরে আসত। এবং সমসের মেহেরের মুখে সব শুনেছে, মেহের এ-অঞ্চলের মানুষ, সে তার দেশের নানারকমের সংস্কৃতির ভিতর সেনেদের দুর্গাপূজার কথা প্রায়ই বলত। মেহেরের বাবা সেনেদের বাড়ির খেয়ে মানুষ। সে ঘোড়া এবং পুকুরের মাছ পাহারা দিত।

সমসের চারপাশে তাকালে আরও দেখল, ডানদিকে ঘন বাঁশঝাড়। অনেক দূর চলে গেছে। মাথার উপরে আকাশটা এখানে লম্বা হয়ে আছে। অন্ধকারে একটা প্রাণীর চোখ, বোধহয় বনবেড়াল হবে। চোখ দুটো জ্বলছে। সে ঢিল দিয়ে দেখল অন্য কিছু কিনা। তারপর খস খস পাতার শব্দ। জন্তুটা পাশের নালা পার হয়ে বাঁশবনে ঢুকে গেল। তখন সে সজনে ফুলকে সঙ্গে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। ডাকল—সজনে ফুল!

সমসের কোন সাড়া পেল না।

এবার সে বলল, সজনে ফুল—তিন নম্বর কুটির।

এবারেও সে সাড়া পেল না। সে খুব বিস্মিত। ভিতরটা অন্ধকার। এমন কি কোন শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। ভিতরে কেউ আছে বলেও মনে হচ্ছে না।

সে ভাবল, ভুল করে সে অন্য জায়গায় চলে আসেনি তো! সজনে ফুল কি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে! সে কি একটা ট্র্যাপের ভিতর পড়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ত্বরিতে একপাশে সরে দাঁড়াল। এবং পকেট থেকে সে ওটা বের করার আগে শেষ বারের মত ডাকল, সজনে ফুল, তিন নম্বর কুটির, তালপাতার পাখা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চিচিং ফাঁকের মত দরজা খুলে গেল। দরজা খোলার শব্দে অন্ধকারে কিছু বাদুড় উড়ে গেল। কড় কড় শব্দটা ওর কানেও ভীষণভাবে বেজেছে। প্রায় ওকে ঠেলে কারা ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। সঙ্গের সজনে ফুলকে ওরা ভিতরে ঢুকতে দিল না। কি নির্দেশ আছে সে এখন বুঝতে পারছে না। এবং ঝোপ-জঙ্গলে কিছু পাখি কলরব করে উঠল।

ভিতরে কেউ কেউ যে বসে আছে এবং দ্রুত নিশ্বাস ফেলছে, টের পাওয়া যাচ্ছে। সমসের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেছে এবং এ-সময়েই দেখল ওর মুখে টর্চ না ফেলে পায়ে টর্চ মারছে কে! মুখ দেখার বোধহয় নিয়ম নেই। সে সেই টর্চের আলোতে দেখল ওর কেডস জুতো ছিঁড়ে গেছে। এবং বৃদ্ধাঙ্গুলটি বের হয়ে কচ্ছপের গলার মত দেখাচ্ছে। পা কেটে রক্ত পড়ছে। কখন হোঁচট খেয়ে নোখটা উঠে গেছে সে টের পায়নি।

ভিতরের দিকে তাকে নিয়ে প্রথম টর্চ জ্বলতেই বুঝল মেহের তার পাশে বসে আছে। সে এবার শুনতে পেল, মেহের ফিসফিস গলায় বলছে, আমাদের তিন নম্বর কুটির ছেড়ে দিতে হচ্ছে ভাইসাব।

সমসের বলল, তার মানে?

—খবর এসছে একটা বড় ইউনিট আসছে। তিন নম্বর কুটিরের খবর পৌঁছে গেছে। আমরা আপনার জন্যই শুধু বসে আছি।

—এখানকার সব কিছু কোথায় আছে?

—বাড়ি বাড়ি সব পাচার করে দিয়েছি।

—পঞ্চমীঘাটে কাদের পাঠালে?

—তিনজন গেছে। আমাদের গাবতলি স্কোয়াড বৈদ্যের বাজারে ধরা পড়েছে। ওদের ওখান থেকে পঞ্চমীঘাটের স্কোয়াডে একজন থাকার কথা ছিল। ফলে এখন চারজনের জায়গায় তিনজন পাঠাচ্ছি।

—ওরা এখনও রওনা হয়নি?

—এখান থেকে চলে গেছে। নান্নুদের বাড়িতে খেয়ে নেবে। ময়না রেঁধে-বেড়ে খাওয়াচ্ছে। কবে ফিরবে ঠিক কি? কি-ভাবে ফিরবে কে জানে! তাই দুটো খেয়ে নিতে বললাম।

—ভাল করেছ। তবে আর দেরি কেন? ছেড়ে যখন দিতেই হবে, মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই।

—কিছু নেবার এখনও বাকি আছে। বলে সে টান মেরে সতরঞ্চটা খুলে ফেলল। দেয়ালের কাছে ঠিক তিন হাত বাই দুই হাত

এবং প্রায় সাত ফুটের মত গর্ত, গর্তের নিচে পাঁচটা রাইফেল এবং কার্তুজের একটা বাক্স। এটা নিয়ে নিতে পারলেই শেষ। মেহের বলল, যারা বসে আছে তারা আপনি এলে রওনা দেবে কথা আছে। এ-ক'টা হাত-ছাড়া করিনি। আপনি আসার আগে ওরা যদি চলে আসে, সেজন্য রেখে দিয়েছিলাম, লড়াইটা এখানেই আরম্ভ করে দেব ভেবেছিলাম।

ওরা এবার রাইফেলগুলি কাঁধে ফেলে নিল। কার্তুজের বাক্সটা মেহের বগলে নিয়ে বের হল। এবং সেই যে তিন হাত বাই দুই হাতের গর্ত, তক্তপোষের নিচে সতরঞ্চিতে ঢাকা থাকত, তা ওরা কোদাল মেরে বিনষ্ট করে দিল। এবং ওরা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলে কথা থাকল আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। আগুন লাগাবার জন্য ১১৯ নম্বর সজনে ফুলকে রেখে দেওয়া হল।

সমসের হাঁটছিল। সে অন্ধকারেই ঘড়ি দেখল। দশটা বেজে বাইশ মিনিট। যারা পঞ্চমীঘাটে যাবে, তাদের সাইকেলে যেতে অধিক সময় লাগলে ঘন্টা দুই। আর দিলীপের পঞ্চমীঘাট পৌঁছাতে রাত চারটার আগে হবে না। এমন কি বাধা পেলে রাত ফর্সা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করল না। দন্দি যারা যাবে তাদের রাত বারোটার পর রওনা হলেও হবে। পাকা রাস্তায় অবশ্য যাওয়া কঠিন। মোড়ে মোড়ে সৈন্যদের টহল আছে। ওরা যাবে খংসারদির পাশ কাটিয়ে। সোজা বারদী উঠে যাবে। তারপর নওগাঁ ডাইনে ফেলে একটা কাঠের সাঁকো, সে হিসেব করে দেখল কাঠের সাঁকো একটা নয়, দুটো। বারদীর পরে ছাগল বামনি নদীতে একটা সাঁকো আছে। ওরা দুটো কাঠের সাঁকো পার হয়ে যাবে। ওরা তারপর যেখানে লাধুর চর-দন্দি-মহজমপুরের ভিতর নদীর একটা চড়া আছে সেখানে অপেক্ষা করবে। দন্দির শ্মশানঘাটই সব চাইতে ভাল জায়গা, রাতে ভয়ে কোন মনুষ্য সেখানে যায় না।

সে বুঝতে পারল এখন ওরা নান্নুদের বাড়ি যাচ্ছে, নান্নু মিঞা

অঞ্চলের বড় গৃহস্থ। সে আওয়ামী লীগের হয়ে খুব খেটেছে। মজিবুর সাহেবের বান্দা লোক। এখন সে সব ছেড়ে দিয়ে আল্লার নামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেশের কাজ, জমি-জিরাতের চেয়ে বড় মনে হয়েছে। গোলার ধান সে সংরক্ষণ করছে। অসময়ে যেন কোন সজনে ফুলের আহারের না অভাব হয়। সে উঠেই দেখল, নান্নু মিঞা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। কে বলবে নান্নু মিঞাকে দেখে বাড়ির ভিতর সে বড় একটা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বাড়ির সামনে পুকুর। পুকুরের উত্তরে খাল। মরা একটা কড়ুই গাছ। পুকুরের পাড়ে পাড়ে করমচা গাছ। গাছে ফুল এসেছে। ওরা যেতে করমচা ফুলের গন্ধ পাচ্ছিল। ওদের দেখেই নান্নু মিঞা উঠে এল। গ্রাম থেকে আরও সব মানুষজন এসেছে। এই অঞ্চলের সব মানুষ জয় বাংলার হয়ে কাজ করছে বলে—সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। কোন ভয় নেই এমন ভাব চোখে-মুখে। তবু যে যে বাড়িতে দুর্গ তৈরি করছে, সেখানে সবাইকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সব কিছু দেখতে দেওয়াও হচ্ছে না। কারণ এরই ভিতর কেউ কেউ টাকার লোভে নিজেদের দেশদ্রোহী করে তুলছে। কে যে ভিতর থেকে চরের কাজ করছে কেউ টের পাচ্ছে না। ধরা পড়লে গুলি করে হত্যা করছে। এবং সব মানুষেরা, যারা বাংলাদেশের মানুষ—সবাই এসে মৃতদেহের উপর থুতু ফেলে যাচ্ছে। এবং ক্রমে এইভাবে এই সব অঞ্চলে সব মানুষের ভিতর—এই যে বাংলাদেশ, এবং জননীর মত তার মাঠ ঘাট এবং ফসলের ক্ষেত সব অতীব প্রিয় বস্তু, মা জননী, জগৎময়ী মাতা আমাদের, তার উপর আর কিছু থাকতে নেই।

সমসের কাছে গেলেই নান্নু মিঞা বলল, সালেম আলাই কুম।

সমসের বলল, আসছালাম আলাই কুম।

তারপর হাত ধরে পরস্পর ঝাঁকি দিল। এবং একে অপরকে আলিঙ্গন করলে সব কিছু দেখাতে হয় এমন একটা মুখ করে রাখল নান্নু মিঞা। গায়ে বোধহয় সমসেরের এখন জ্বর নেই। মাথাব্যথাটা কম। উত্তেজনায়

সে অধীর হয়ে আছে বলে টেরও পাচ্ছে না শরীরের ভিতর যে কষ্ট তার রকম সকম কি। সে নাম্নু মিঞার সঙ্গে হাঁটতে থাকল। পেঁয়াজ-রসুনের ঝাল ঝাল গন্ধ আসছে। মাছের ছালোন রান্না করছে তবে ময়না। চারপাশে এখন তার মানুষজন। খবরাখবর নিচ্ছে। ঢাকা-নারাণগঞ্জে কি রকম মানুষ মরেছে, গোলায় কত মানুষের প্রাণ গেছে—এসব খবরই বেশি দিতে হচ্ছিল সমসেরকে। কারণ কেউ এখানে সঠিক খবর পাচ্ছে না। নানারকম গুজব রটছে। কেউ বলছে মুজিব সাহেব ধানমণ্ডির বাড়িতেই আছেন, সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে, কাউকে যেতে দিচ্ছে না। কেউ বলছে, না, তিনি পালিয়ে গেছেন। আবার কেউ বলছে, তিনি এখানে নেই, মুলতানে তাঁকে নিয়ে গেছে। ঢাকার রেডিও থেকে কিছু খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। বন্ধ। কলকাতার খবর রেডিওতে, মুজিব আছেন, বাংলাদেশের মানুষের ভিতরই আছেন।

সমসের যতটা পারছিল কম কথা বলছিল। সে নিজের চোখে যা দেখেছে শুধু তাই বলছে। এতক্ষণে মনে হল, সেই খুদে বাচ্চাটাকে সে কোলে করে নিয়ে এলে পারত। ওদের কাছে বাচ্চটা রেখে আসা ঠিক হয়নি। বাচ্চাটাকে নিয়ে মিনু আবুল দিলীপ বিপদে পড়ে যেতে পারে। সে এমন একটা বোকামির কাজ কেন যে তখন করতে গেল! বস্তুত সমসের সেই দৃশ্যটা সহ্য করতে পারেনি। চোখের উপর এমন দৃশ্য দেখা যায় না। ছোট বড় নির্বিশেষে মেশিনগানের গুলিতে নৌকার পাটাতনে, নদীর চরে, এবং যে যেখানে দাঁড়িয়ে অথবা বসেছিল একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে। ওরাও যেত। কিন্তু প্রথম থেকেই ওরা আক্রমণ প্রতিরোধের নিয়ম-কানুন কিছু কিছু জেনে ফেলেছে। ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্, ক্রমান্বয়ে ক্লিক্ শব্দ হতে থাকলেই ওরা বুঝতে পারে মেশিনগান দাগা হচ্ছে। ওরা তখন নিমেষে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে জানে। আর এইসব সাধারণ মানুষেরা পাগলের মত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দৌড়ায় এবং মরে। খুদে বাচ্চাটার মা

ছইয়ের ভিতর ঢলে পড়েছে। চক্ষু স্থির। হাত পা শিথিল। বাচ্চাটা টের পাচ্ছে না। বাচ্চাটা বুক বেয়ে দুধ খেতে উঠে যাচ্ছে। গলা ফুটো করে বোধহয় গুলি বের হয়ে গেছে অথবা মাথা এফোঁড় ওফোঁড়। রক্ত গলগল করে পড়ছে। অন্ধকারে বাচ্চাটা কিছু টের পাচ্ছে না। দুধের সঙ্গে মায়ের রক্ত চুষে খাচ্ছে। এবং আশ্চর্য, মেয়েটা এতটুকু কাঁদছে না। ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে ওর চোখের ভিতর সমসের কি দেখে যে টেনে আনল কোলে—এখন সে বুঝতে পারে দৃশ্যটা দেখে সে স্থির থাকতে পারেনি। কাঠের বাক্সটার মত এটাও তার একটা কাজ, একে রক্ষা করার দায়িত্ব তার—এমন ভেবে ফেলেছিল। এখানে নিয়ে এলে ময়না বাচ্চাটাকে দেখা-শোনা করতে পারত।

ময়না খলখল করে হাসতে হাসতে বের হয়ে এল উঠোনে। বলল, ভাইসাব সালাম। রান্না হয়ে গেল। দুটো আপনিও খেয়ে নেন।

—আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। বলে সে ময়নার চোখে কি দেখল, তারপর বলল, যাদের পাঠাচ্ছি তাদের আগে খাইয়ে দাও।

মেহের ঘর থেকে বের হচ্ছিল। কার্তুজের বাক্সটা সে ভিতরে রেখে এসেছে। সে ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, সমসের ভাই, একবার ভিতরে আসুন।

ভিতরে সে ঢুকলে দেখল তক্তপোষের নিচে সেই গর্ত। এবং শান-বাঁধানো। উপরে কাঠের পাটাতন। দুজন লোক দাঁড়িয়ে রাইফেল চালাতে পারবে। ট্রেঞ্চের মত করে কাটা। সামনে বেড়া কাঠের। কাঠ তুলে দিলে সামনে মাঠ। এদিকেও খোলা যায়, ওদিকেও খোলা যায়। ট্রেঞ্চ অদ্ভুত কায়দায় তৈরী।

মেহের বলল, সব ক'টা দেখতে আপনার অনেক সময় লাগবে। কাল সকালে দেখাব আপনাকে।

সমসের চারপাশটা ভাল করে দেখল। এখন উঠোনে কিছু কিছু গ্রামের লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সমসেরকে দেখতে এসেছে। সমসেরই এই অঞ্চলের উপরওয়ালা। ওর নির্দেশ মত মেহের, অরুণ

সব কাজ চালাচ্ছে। এবং ময়নাকে সে এখানে এনে রেখেছে। কামালের সঙ্গে যোগাযোগ সে করতে পারছে না। কামাল ঠিক সবার খবর পেয়ে যাচ্ছে। কামাল খুব সন্তর্পণে সংগঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই সব যত মনে হচ্ছিল, তত আবুলের চোখ ওকে কেন যে বার বার টানছে। বাপজান আমি পারব তো?

তুমি ঠিক পারবে বাপজান। তোমার জননীর ইজ্জত তোমার হাতে। সে জননী বলতে এখন মিনু এবং ধরিত্রী উভয়কে বোঝাচ্ছে।

ময়না এসে বার বার বায়নাক্কা করছে, সমসের ভাই, হাত-পা ধোবার জল বদনাতে রাখছি। হাত-পা ধুয়ে দুটো খেয়ে নিন।

নান্নু মিঞার বৈঠকখানায় এখন একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। পুকুরের পাড়ে মসজিদ। মসজিদের বারান্দায় মনে হল কেউ বসে রয়েছে। অথবা কেউ এসেছে মোমবাতি জ্বালতে। এত রাতে মোমবাতি জ্বালতে আসা কেন?

নান্নু মিঞা বলল, ওডা এক পাগলের কাণ্ড।

—কে সে পাগল?

—নাম হামিদ।

—কি করে?

—কিছু করে না। কেবল বাজারে গঞ্জে গান গায়। অর বিশ্বাস মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখলে মুজিব সাহেবের কোন ক্ষতি কেউ করতে পারব না।

সমসের বলল, বেশি আলো জ্বেলে রাখবেন না। সব সময় এখন অন্ধকারে থাকার চেষ্টা করবেন।

—তা আলোডা নিবু নিবু কইরা রাখতে কইছি।

সমসের জানে এরা সমর-কৌশলে অজ্ঞ। এরা শুধু বললে, প্রাণ দিতে পারে। প্রথম প্রথম ক'দিন ওদের প্রাণ দেবার যেন শেষ ছিল না। আবেগে ওরা ভেবেছিল, হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু। ওরা সেই সব খান সেনাদের মানুষ ভেবেছিল। দুবার তিনবার চারবার।

নিরস্ত্র মানুষ যখন মরবে তখন ওরাই হয়তো বন্দুকের নল ঘুরিয়ে ধরবে।. কি যে আশা কুহকিনী? সমসেরের কুহকিনী শব্দটাই এ সময়ে ব্যবহার করতে ভাল লাগছে।

সে বলল, আমাদের এখন আবেগের বশে কিছু করলে চলবে না নানু মিঞা। সে একটা চেয়ারে বসে নানু মিঞার ঘরে জানালা এবং পাটের পুরানো গাঁট দেখতে দেখতে এমন বলল। তারপর সহসা যেন কিছুই ঘটছে না বাংলাদেশে এমন চোখে বলল, পাটের কি দর যাচ্ছে?

—গণ্ডগোলের আগে পাঁচচল্লিশ টাকা দাম উঠছিল।

—আসার সময় একটা জুটমিলে আগুন লেগেছে দেখলাম।

—আমাগ আর কিছু থাকব না।

সমসের চুপচাপ বসে থাকল। সে একটা ইংরেজী বই, বইটাতে রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবের দিনগুলির কথা লেখা আছে, সে হ্যারিকেনটা উসকে বইয়ের পাতা মেলে রইল। এবং সে জানে, একটু বাদেই অরুণ আসবে তার দলবল নিয়ে। মেহের, অরুণ, আবেদালি, ফিরোজ এই চারজনকেই সে দন্দি পাঠাবে ভাবল। মেহেরকে না পাঠালে হাসিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। মেহের ও-অঞ্চলের সব ভাল চেনে।

. পাশের তক্তপোষটায় একটা বাচ্চা ছেলে এসে একটা মাদুর বিছিয়ে দিল। ওরা গোল হয়ে এখন খেতে বসবে। নানু মিঞার বিবি ঘরের বার হন না। ময়নাই সব এনে এনে এই বৈঠকখানায় রাখছে। ভাত ডাল এবং চাপিলা মাছের ঝোল।

এবং তখনই অরুণ এসে গেল। ওর সঙ্গে সাবির, মাতিন, কবিরুল। ওদের কাঁধে রাইফেল। অরুণ এলেই সমসের উঠে দাঁড়াল। এবং সবাইকে আলিঙ্গন করে বলল, তোরা ভাল আছিস?

অরুণ কাঁধের রাইফেলটা নামিয়ে রাখল। ওরা যেন সব সময় প্রস্তুত হয়েই আছে। ওদের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওরা নদীর

পাড়ে যে থানা আছে তা দখল করে নিয়েছে। এবং সেখানে সব সময় দশজনের একটা দল পাহারা দিচ্ছে। এ-অঞ্চলে কিছু অর্থাভাব দেখা দিয়েছে। এখন গ্রীষ্ম কাল বলে জল নেই, ঘাস মাটি শুকনো, চাষাবাদ হতে পারছে না। তবু যেখানে সামান্য জল আছে ওরা জল ছিঁচে বোরো ধান চাষ করছে। সব মানুষের ভিতর এক আশ্চর্য কঠিন প্রতিজ্ঞা। কেউ আর বসে থাকছে না। যে যার মত জননীর হয়ে খাটছে। এমন দৃঢ়তা সমসের যেন এই মানুষেব ভিতর প্রথম দেখছে। সে বলল, হাত-পা ধুয়ে তোরা আগে খেয়ে নে। অরুণ তোকে দন্দি যেতে হবে। মেহের তুই আবেদালি ফিরোজ যাবি। মেহের বলছিল ফিরোজকে যেতে হবে না। সে ময়নাকে নেবে। ময়না তাদের সঙ্গে যাবার জন্য পাগল হয়ে গেছে। তারপর কবিরুল, মাতিন, সাবিরকে ডেকে বাইরে নিয়ে গেল। এবং ওদের কি বলে সে ফের ঘরে চলে এল।

অরুণ কি ভেবে বলল, ময়না যাবে এমন তো কথা ছিল না।

—তবে ওর যাওয়া ঠিক না। ওকে বরং ১৭নং কুটিরে পাঠিয়ে দে।

—মেহেরকে ডাকি।

মেহের এলে বলল, ময়না ১৭নং কুটিরে যাক। সেবা-শুশ্রূষার জন্য আরও লোকের দরকার।

মেহের মনে মনে অন্য রকম চাইছে। কারণ তার কাছে শেষ খবর যা এসে পৌঁছেছে তাতে সে জানে দন্দি, মহজমপুর এবং আলিপুরার দিকটাও নিরাপদ নয়। মিনু-ভাবীব পক্ষে সম্ভব নয় হাতে পড়ে গেলে রক্ষা পাওয়া। একমাত্র ময়না পারে। ময়না ইতিমধ্যেই নানা কৌশল শিখে ফেলেছে। আর আশ্চর্য, সে বার বার পারও হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা সম্ভব হচ্ছে একমাত্র ময়নার চোখের জন্য। চোখে সুর্মা দিলে বড় মায়াবিনী লাগে এবং সে পুরুষদের মত অনায়াসে সাইকেল চালাতে পারে। সে কাঁধে

রাইফেল নিয়ে দীর্ঘপথ হাঁটতে পারে। হাঁটতে ওর কষ্ট হয় না। ময়না বলেছিল, আমি ওদের ভিতরে ঢুকে যদি সবাইকে মজিয়ে রাখতে পারি!

মেহেরের মনে হয়েছিল পরামর্শ মত গেলে ভালই হবে। সঙ্গে থাকলে সে ময়নাকে নানাভাবে কাজে লাগাতে পারবে। ময়না কথা বলে উর্দু ভাষায় এবং গানও গাইতে পারে—ওর ইচ্ছা সেই পাগল মানুষটাও সঙ্গে যায়, যে মোমবাতি জ্বালায়। তাকে নিতে পারলে খারাপ হবে না। সে ডুগডুগি বাজাবে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে বাজাবে। আকাশ-বাতাস দুলে উঠবে, থমকে সে যদি পায়ের তালে বোল দিতে পারে, আর বোরখার নিচে সে যদি বিবি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তবে খানেদের জিবে লালসায় জল আসবে। এবং এ-ভাবে কিছু কৌশল করতে পারলে সহজে কাজ হয়ে যাবে; অথবা যেতে পারে।

সে জানে সমসের কিছু বললে তার উপরে আর কিছু হতে পারে না। তবু সে তার পরিকল্পনার কথা মোটামুটিভাবে খুলে বললে সমসের কেন জানি চুপ হয়ে গেল। গরম থেকে তাপ উঠেছে। কাঠের বারকোষে উঁচু করা ভাত। কাঠের হাতা। কলাই-করা বাটিতে ডাল। সবই গরম। এবং যারা এখন হাত-পা ধুয়ে এসেছে তারা মাদুরে গোল হয়ে খেতে বসে গেল। সে ওদের দিকে তাকাল না। জানালা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে, আকাশে কত নক্ষত্র। সবুজ নক্ষত্রটার নিচে হয়তো এখন মিনু আর আবুল আছে। ওদের জন্য কি যে মায়া! কিছুতেই সে আবুলের মুখ, মিনুর মুখ ভুলে থাকতে পারছে না। সে বলল, ঠিক আছে। যদি দরকার মনে করিস নিয়ে যা। তবে অযথা ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দিস না।

খেতে বসে সমসের চুপচাপ খেতে লাগল। খুব একটা কিছু খেল না। খেতে ওর ভাল লাগছে না। তবু না খেলে সে যে তার স্ত্রী

এবং সন্তানের জন্য খুব বেশি ভাবছে, ধরে ফেলবে সবাই। এখন ঐ সময়ে নিজের বলতে কিছু নেই। সবাই নিজের। সবাই আপনার। কোন্ পরিবার-ভিত্তিক ভাবনা এখন ঠাঁই দিতে নেই। গোটা বাংলা-দেশ এখন এক পরিবারের। এই সব, গ্রহ নক্ষত্র যা কিছু দেখা যায় সব যেন একই পরিবারের হয়ে দেখা। সে মুখ নিচু করে খেয়ে, পেট ভীষণ ভরে গেছে এমন ভান করল চোখে-মুখে।

॥ ছয় ॥

ওদের আর দেখা গেল না। মিনুবৌদি, আমিনুল, আবুল নদীর পাড়ে উঠে গেল। খুব খাড়া পাড়। সোজা ওপরে উঠে গেছে মত। দিলীপ ওদের গাছপালার ভিতর দেখল তিনটে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখন তার কাজ নৌকাটাকে ঠেলে মাঝগাঙে নিয়ে যাওয়া। জল সেখানে বেশী। নৌকা টেনে নিতে কষ্ট কম হবে।

এখন নৌকাটাকে নৌকা না বলে ঝোপ বলাই ভাল। বনঝোপ। নদীর ওপরে আশ্চর্য একটা ছোট্ট মায়াবী দ্বীপের মত লাগছে। সে গলুইতে একটু সামান্য জায়গা রেখেছে দাঁড়াবার। সে সেখানে দাঁড়িয়ে নৌকা বাইছে। ধামরাই পর্যন্ত সে এ-ভাবে যাবে। তারপর দু-পাড় আরও খাড়া। সেখানে খান সেনাদের ছাউনি এবং পাহারায় আছে তারা, যেন কোন কিছু শহর থেকে না যায়। ওদের কাছে খবর আছে, বন্দর থেকে প্রতি রাতে একটা করে কাঠের বাক্স যাচ্ছে। কোথায় যে যাচ্ছে, কি ভাবে যাচ্ছে, ওরা ধরতে পারছে না। ওরা দু পাড় এবং এ-অঞ্চলে যেখানে যত জায়গা আছে, গলিঘুঁজি আছে, মেশিনগান দাগতে দাগতে ঢুকে পড়েছে। আশ্চর্য, ওরা কিছুই পায়নি। কেবল মৃতদেহ—মানুষের এবং কুকুরের। ছোট বড় সব রকমের মানুষ। ওরা মরে পড়ে আছে। পথের উপর ওরা পড়ে থেকে থেকে ফুলে-ফেঁপে গেছে। শকুন, কাক উড়ছে এবং যে সব কুকুর মরেনি, তারা মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। অথচ একটা রাইফেল অথবা কার্তুজ উদ্ধার করতে পারে নি। ফিরে আসার সময় ওদের গাড়ি-গুলির ভিতর কিছু সৈনিকের মৃতদেহ, যারাই একা অথবা দুজন করে গলি-ঘুঁজিতে ঢুকে গেছিল—তারা আর ফিরে আসতে পারে নি। ওরা আক্রোশে, ভয়ে, খালি জায়গায় অথবা বলা যায় তখন

নিরাপদ জায়গা থেকে কামানের গোলা ফেলতে ফেলতে পিছু হটে এসেছে।

এবং দিলীপ জানে এ-ভাবেই এ-অঞ্চলে সবুজ রণক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এবং এ-ভাবেই দিনযাপন হবে, এবং এ-ভাবেই মানুষের বিনিময়ে রাইফেল—আর মানুষ তাই সম্বল করে লড়বে। যখন তেমন কিছু মিলছে না, তখন রাইফেল একটা থাকবে, পাশে দশজন মানুষ থাকবে। রাইফেল নিয়ে বসে থাকবে তারা। ট্রেনচ্ কাটা থাকবে। একটা মানুষ মরে যাবে, ট্রেনচে সে পড়ে গেলে পাশ থেকে আর একটা মাথা উঁকি দেবে। এ-ভাবে দশটা মানুষ একটা রাইফেল, মনোবল রাইফেলের অজস্র। মানুষের কাছে একটা রাইফেল থাকলে ওরা এক পল্টন খান সেনার বিরুদ্ধে লড়তে পারবে।

সে গলুইতে দাঁড়িয়ে লগি মারতে থাকল। জল এখানে সাঁতার। নদীর পশ্চিম তীরে বড় বড় চর। এবং সেখানে তরমুজের জমি করার বাসনা মানুষের। আর কিছু রাতের পাখি তখনও ডাকছিল—টিট্টিভ। বেশি দূর আর যেতে পারছে না। একটু পরেই নৌকাটাকে ফের কিনারে নিয়ে যেতে হবে। এবং লাফিয়ে জলে পড়তে হবে।

ওরা আলোটা দিয়ে টর্চ মেরে দেখার মত আকাশ দেখছে এখন। এবং এত কাছাকাছি যে, ওরা আলোটা ঘুরিয়ে ফেললেই দেখতে পাবে সহসা নদীতে এক বনের সৃষ্টি হয়েছে। মাঝনদীতে বনঝোপ দেখলে সন্দেহ হতে পারে। ওখানে সাঁতার-জল, অবশ্য সাঁতার-জল কিনা জানে না, ওরা জানে শুধু ওটা নদী, নদীর পরিমাপে খবর আছে, জল ওখানে বেশি। প্রায় সাত ফুটের মত। সে জল সাঁতরে পার হওয়া যায় না, অথচ আশ্চর্য এমন খোলা-মেলা নদীতে বন সৃষ্টি হয়ে গেল সহসা। বন কি অন্য কিছু, মর্টার দেগে একবার দেখে নিলেই দিলীপচন্দ্র খতম। সে তাই মাঝ-গাঙে বেশিক্ষণ আর নৌকা রাখতে ভরসা পেল না। নৌকার মুখ পাড়ের দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আর ঘুরিয়ে দেবার সময়ই মনে হল যেন একটা সার্চলাইট আকাশ

থেকে নেমে আসছে। লাইটহাউসের আলোর মত আবার ঘুরে ঘুরে ডানদিক, বাঁ-দিক দেখতে দেখতে ঠিক মাঝ-গাঙে নেমে এসেছে। তাকে দেখে ফেলতে পারে ভয়ে সে লাফ মেরে জলে নেমে গেল, এবং নৌকার নিচে ডুবে থাকল। নৌকাটাকে আপ্রাণ এক হাতে শক্ত করে টেনে রাখল। যেন নড়ে না। যেন ভেসে যায় না। একটা বনঝোপ সচল হয়ে গেছে দেখলে ব্যাপারটা ওদের কাছে ভৌতিক মনে হবে। ওরা আলোটা সেই ভৌতিক বনঝোপের সঙ্গে সঙ্গে টেনে আনবে, তারপর কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বলবে, শালা ভূত ভি খতম।

ওর খতমের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। দিলীপচন্দ্র হুঁশিয়ার। খুব হুঁশিয়ার। সে মাঝে মাঝে ভেঁাস করে জলের উপরে ভেসে উঠে দেখছে আলোটা নৌকার উপর স্থির হয়ে আছে না পিছু কিংবা ডান-দিক বাঁ-দিক নড়ছে। ভেঁাস করে ভেসে উঠলেই সে দেখল এখন আলোটা চরের ওপর এবং ওপাড়ের কল-কারখানা পার হয়ে আবার আকাশের দিকে উঠে স্থির হয়ে আছে।

সুতরাং ওরা এটা ঝোপই ভেবে ফেলেছে, অথবা দূর থেকে একখণ্ড কচুরি-পানার ঝাঁকও মনে হতে পারে। কারণ এত ওপর থেকে সব স্পষ্ট হতে পারে না। সন্দেহ হলে ওরা বার বার ঘুরিয়ে এনে আলোটা এখানেই ফেলত। সে আর দেরি করল না। গলুইতে উঠে সে আপ্রাণ লগিতে ভর দিতে থাকল। সে লগিটা দিয়েই হালের কাজ চালাচ্ছে, সাধারণ নৌকা হলে ওকে এত বেগ পেতে হত না। অনেকটা জায়গা জুড়ে ঝোপ-জঙ্গল, এবং কিছু ডালপালা জলের ভিতর পর্যন্ত নেমে গেছে। ফলে নৌকাটা এগুচ্ছে না। জলের ভিতর ডালপালা নানা-ভাবে বাধার সৃষ্টি করছে।

সে কখনও ডুবে, কখনও লগি মেরে, নৌকা একেবারে কিনারায় নিয়ে এল। এবং দেখল এখানে নদীর পাড় খাড়া না। বরং এখানে এত বেশি গাছপালা যে সে ভাবতেই পারে নি একটা বনের ভিতর আর একটা বন সেঁদিয়ে গেছে। সে তখনই দেখল মাঝ-গাঙে আলোটা

ফেলে ওরা আবার কি যেন খুঁজছে। বুঝি কিছুক্ষণ আগে যে কচুরি-পানার মত বনঝোপ দেখেছিল, এখন সেটা না দেখে বিস্ময়ে চারপাশটা খুঁজছে। মনের ভুল কি চোখের ভুল, টের করতে না পেরে নিজেরা হয়তো এখন ছাউনির ভিতর গুঁতোগুঁতি করছে। দিলীপচন্দ্র মনে মনে না হেসে পারল না। বস্তুত, গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে ভারি মজার হয়ে গেছে। যেন সে খেলায় মেতে গেছে, লুকোচুরি খেলায়। প্রাণের বিনিময়ে এ-খেলা তার মনেই হচ্ছে না। সে জলে ভেসে নৌকাটাকে কিনারে কিনারে ভাসিয়ে নিতে লাগল। শরীরে ক'টা জোঁক এবং শত সহস্র উলানি পোকা ঘিরে ধরেছে তাকে, অথবা সে যে একজন মনুষ্য, তার চলা-ফেরাতে টের পাওয়া যাচ্ছে না। সে নিশীথের প্রাণী হয়ে গেছে। সে এখানে একটা বকুল গাছের নিচে নৌকা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাও টের পাচ্ছে। কারণ বকুল ফুলের গন্ধে সে টের পাচ্ছে—এই হচ্ছে বাংলাদেশ। যেমন নদী-নালা, সূর্যকিরণ এবং আকাশ দেখলে টের পায় এ বাংলাদেশের আকাশ, বাংলাদেশের সূর্যকিরণ, বাংলাদেশের নদ-নদী, তেমনি সে এখন টের পাচ্ছে এ বাংলাদেশের বকুল ফুলের গন্ধ। নৌকাটাকে ঠেলে নিতে যে ক্লান্তি এসে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল, বকুল ফুলের গন্ধে কেমন তা নিমেষে উবে গেল।

তাকে এখন নানাভাবে হুঁশিয়ার হতে হবে। কারণ সামান্য একটা সন্দেহ যে ওদের প্রাণে দেখা দিয়েছে, সে আলোটার একটু সময়ের জন্য থেমে থাকা এবং যে জায়গায় সে ছিল তার চারপাশটা খুঁজে দেখা দেখেই টের পেয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার দেখলে ওরা মর্টার দাগতে পারে। আর, হয়েছে বেশ। সে কখনও মর্টার অথবা কামানের ব্যবধানটা ধরতে পারে না। সে যে রাইফেল চালাতে শিখেছে সেও সামান্য ক'দিনের ব্যাপার। মোটকথা বলতে গেলে সে মাত্র ট্রিগার টিপতে জানে। সে বার বার রাইফেল নিয়ে বসে থাকলে অথবা পাহারায় থাকলে কেমন বিড়বিড় করে মনে মনে বকতে

থাকে—এমিং, হোল্ডিং, টিগ্রারিং এক হতে হবে। মনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। সেরা মার্কসম্যান হতে গেলে এসব লাগে। সে যতবার যেখানে ট্রেন্‌চে ছিল ততবার সে এমন কথা ভেবেছে। প্রায় মনের ভিতর কথাটা ওর মন্ত্রের মত হয়ে গেছে, এখনও তাই হচ্ছে। ওর, শেষ কিছু সময়ের ভিতর শেষ রক্ত-বিন্দু এবং এমিং ট্রিগারিং হোল্ডিং এই হচ্ছে নির্ভর। কিন্তু সে অন্ধকারে কি ভাবে যুঝবে ওদের সঙ্গে মনে মনে স্থির করে উঠতে পারছে না। তাকে সেজন্য বেশি করে পালাবার ফন্দিই আঁটতে হবে। রক্তের ভিতর যে তাজা ভাবটা আছে, ওকে কখন তা গ্রাস করবে, কখন সে মরিয়া হয়ে সব ফেলে রাইফেল নিয়ে বসে যাবে বনের ভিতর অথবা চুপি চুপি সিঁড়ি ভাঙার মত খাড়া পাড় ভেঙে বনঝোপের আড়ালে উঠে যাবে এবং ঠিক ছাউনির সামনে গিয়ে এক দুই তিন, ওর কাছে যদি তিনটে কার্তুজ থাকে অথবা তার পি-ফোরটিন রাইফেলের ম্যাগাজিনে যদি পাঁচটা কার্তুজ থাকে সে এক দুই তিন চার পাঁচ, পাঁচটা লাশ ফেলে দিতে পারলে ম্যাগাজিন সাফ করার জন্য একটু সময় পাবে।

সে নিঃশ্বাস ফেলার সময় বললে, আঃ কি আরাম! মিনুবৌদি তোমরা কত দূরে গেছ! সমসের তুই কোথায় আছিস? আমরা যেখানে যাচ্ছি যদি সেখানে কোন এনকাউন্টার হয়, তুই থাকবি তো পাশে? সে ভাববার সময় খুব সুন্দর করে সব ভা..ত চাইল সুন্দর ভাষায়, কি যে মাধুর্য তাতে, ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু সময় কম। এখন বসে বসে স্বপ্ন দেখলে চলবে না। তাকে এই বনঝোপ, নদীর জল এবং কিনারে ঝিনুক পচা গন্ধ পার হয়ে যেতে হবে। এবং দুটো একটা যে মানুষের মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে, কিনারায় শেয়ালের আর্তনাদে তা সে ধরতে পারছে। সে নাকে কোন রুমাল চাপা দিতে পারল না অথচ সে এগিয়ে যেতে যেতে এসব কি দেখছে! সে প্রথম ভেবেছিল শুধুই ঝিনুক পচা গন্ধ। কিন্তু সে এসব কি দেখছে। এখন ভাবছে মিনুবৌদি আবুল

আমিনুলকে পাঠিয়ে ভালই করেছে। জলে কাদায় সে দেখতে পেল মানুষ মরে পড়ে আছে। অন্ধকারে এত স্পষ্ট সে দেখল কি করে এসব? সে বুঝতে পারল একটা ভয়াবহ আলো তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারপাশটা দেখাচ্ছে। এতক্ষণ যে সে ভেবেছিল বুঝি ঝিনুকের পচা গন্ধটাই উঠছে—কিন্তু এখন সে টের পাচ্ছে ওটা মানুষ পচা গন্ধ। যারাই এই পথে পালাতে গেছে তারাই নিহত হয়েছে। সে এখন ঠেলে ঠেলে কারু হাত পা মাথা মুখ গলা, সব পার হয়ে যাচ্ছে। আহা এটা কি হয়েছে, আহা এ-পোড়া বাংলাদেশের জন্য খোদা আল্লা ভগবান তুমি যেই থাক কাউকে ক্ষমা কোর না। ওর ভিতর থেকে বমি উঠে আসছিল। এত সব মৃতদেহ সংখ্যায় কত সে টের পাচ্ছে না, যেন এক যোজন প্রমাণ মানুষ ফেলে রেখে গেছে। এবং দূরে, অনেক দূরে, যারা খাড়া পাড়ের উপর ছাউনি ফেলে প্রায় বাঘ শিকারের মত বসে রয়েছে, তারা টেরই পাচ্ছে না বুঝি বাংলাদেশকে এভাবে কবর দেওয়া যায় না। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর যেন সহসা একটা দুর্বলতা জেগে গিয়েছিল অথবা ভয় এবং শকুনের আর্তনাদ দূরে দূরে, অথবা মানুষের অন্তরাত্মা ফসলের জন্য কাঁদছে এসব মুহূর্তে উবে গিয়ে সে এক অপার মহিমামণ্ডিত মানুষ হয়ে গেল, বলল, খোদা, বলল, ঈশ্বর, তুমি যেই হও আমার পাশে পাশে থাকো, এ-সময় আমি ভয় পেলে আমার বাংলাদেশ বাঁচবে না। আমাকে নদী পার হয়ে যেতেই হবে। আমার রাইফেল, আমি, আবুল, সমসের মিলে আমার বাংলাদেশ। সে এই বলতে না বলতেই একটা কঠিন কষ্ট বুকের ভিতরে জেগে উঠল। ওর বোনটা, ওর বোনটার সেই আর্ত চিৎকার—দাদা রে। সে এবার শক্ত হাতে ঠেলে ঠেলে নিতে থাকল নৌকা। অজস্র এই মৃতদেহ, প্রায় প্রেত-লোকের মত এক পটভূমি, বৃদ্ধ শকুন মৃত গাছের ডালে বসে, তার নিচে এক তাজা মানুষ সবুজ বন নিয়ে নদীর জল ঠেলে ঠেলে এগুচ্ছে।

সে এগুবার মুখেই দেখল, আলো পড়ছে তার সামনে। সরলরেখার মত আলোটা ঘুরে ঘুরে উঠে যাচ্ছে। সে যতটা পারছে নৌকা খুব কিনার ঘেঁষে রাখছে। এবং গাছের ছায়ায় থাকার দরুন আলোটা গাছের মাথায় পড়ছে, নিচে পড়ছে না। পড়তে পারছে না। পড়লেই বুঝতে পারত ঝোপটা এখানে সেখানে সহসা গজিয়ে উঠছে। এবং ঘুরে ফিরে আলো আবার ফেললে আর দেখা যাচ্ছে না। ঝোপটা ক্রমে এই করে এগিয়ে আসছে।

ওরা টের পেয়েছে না আলো ফেলার এই নিয়ম, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। জলে সব শরীর ভিজা। কাদামাটি বলে মাঝে মাঝে পা বসে যাচ্ছে। যেখানে জল বেশি, ব্যাঙের মত সে সাঁতার কাটছে অথবা ডুব দিয়ে থাকছে। আলোটা যে-কোন সময় এসে তার এখন মাথার উপর পড়তে পারে এবং যে-কোন সময় সে ধরা পড়ে যেতে পারে, কারণ সে খুব কাছাকাছি এসে গেছে। মরা মানুষের হাত-পা এখানে ভেসে নেই। ঝিনুক পচা গন্ধটাও উঠছে না। দুপাড় খাড়া। গত বর্ষায় অথবা প্লাবনে পাড় ভেঙে একেবারে খাড়া পাহাড় বানিয়ে রেখেছে। এবং জলকে ভীষণ ভয় বলে ওরা যা কিছু করছে উপর থেকেই করছে। কেউ জলে নেমে আসছে না।

বাতাসটা বাড়ছে। নদীর জলে দক্ষিণা বাতাস। হিজল ফুল দুলছে। এবং খাড়া পাড় থেকে এবার জলের ভিতর ছপছপ শব্দ টের পেতে পারে, সে এই ভয়ে জলে যাতে শব্দ না হয়, সে ডুবে ডুবে নৌকা টানছে। এবং বাতাস দক্ষিণ থেকে বইছে বলে ওর কষ্ট কম হচ্ছে। সে যতটা না টানছে তার চেয়ে দ্বিগুণ বাতাস ওকে সাহায্য করছে। যদি আগে থেকে বাতাসটা এমনভাবে বইত, তবে সে এতক্ষণ জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারত।

বোধহয় সংসারে এ-ভাবে কোথাও কিছু ঘটছে। না ঘটলে সে যে এতটা পথ এসে গেছে এবং একেবারে ছাউনির সামনে, ওরা টের পাচ্ছে না, ওদের ছাউনির নিচে প্রায় শ' খানেক ফুট নিচে একটা

ঝোপ ক্রমান্বয়ে স্থান পরিবর্তন করে খাড়ি নদীতে ঢুকে যাবার মতলবে আছে, এবং একবার ঢুকে যেতে পারলে আর কে পায়, নদীর পাড়ে পাকা সড়ক নেই, যে সড়ক ধরে ওরা কামান বন্দুক এবং ট্যাঙ্ক নিয়ে তাড়া করবে—তারা তখন একটা ঘাসি নাওকে বন-জঙ্গল ভেবেই বসে থাকবে। নড়তে চাইবে না। ভয়ে ওরা দশ পাঁচজনের দল কোথাও নেমে যেতে চায় না। ওরা এক পল্টন সৈন্য নিয়ে পর্যন্ত চলাফেরা করতে ভয় পাচ্ছে। এক কোম্পানি হলে যেন ওদের সাহসে বুক ভরে যায়। এক কোম্পানি যেতে গেলেই সাঁজোয়া গাড়ি লাগবে। নাহলে কাঁচা রাস্তায়, জলে কাদায় সব খেলনার গাড়ি হয়ে যাবে। সেজন্য দিলীপ ঘাপটি মেরে ঝোপের নিচে বসে রয়েছে। আলোটা ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে গেলেই সে অন্ধকারে নৌকাটাকে আর একটা ঠেলা দেবে। ব্যস, তারপর গাজীর গীত গাও, গলুইতে বসে পান-বাতাসা চিবাও, দেখতে কেউ আসছে না। সে খাড়ি নদীতে অদৃশ্য হয়ে গেলে তাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। তখন সে নদীর জলে এক এক করে সব ডালপালা, হিজলের ফুল ফেলে দেবে।

সে বসে বসে বার বারই আলোটার দিকে লক্ষ্য রাখছে। উপরে নানারকমের বাত্তি জ্বলছে। ওরা উপরের খাড়া পাহাড় মত জায়গাকে শহর বানিয়ে ফেলেছে। দুপারেই ওদের পল্টনের লোকেরা টহল দিচ্ছে। সে এত নিচ থেকেও ওদের বুটের শব্দ যেন শুনতে পার্চ্ছে। অথচ আশ্চর্য, সেই আলোটা ঠিক ওর ঝোপ-জঙ্গল থেকে প্রায় দশ গজ দূরে স্থির হয়ে আছে। একেবারে নড়ছে না। যেন ওরা টের পেয়ে গেছে এবার। খাড়ি নদীতে কিছু ঢুকে গেলেই তারা আর কিছু করতে পারবে না।

না, কিছু আর করণীয় নেই। কেউ কি খাড়ি নদীতে এখন নেমে আসছে? সে দেখল, এবং দেখে ওর বুক শুকিয়ে গেল, প্রায় আট দশ জন খান সৈন্য খাড়া পাড় ভেঙে যেমন পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে আসে

তেমনি নেমে আসছে। এবং যেখানে আলোটা স্থির হয়ে আছে সেদিকে হেঁটে যাচ্ছে। কাদামাটি বলে ওরা একটা স্টিক দিয়ে প্রথম দেখে নিচ্ছে পা দেবে যাচ্ছে কি না। পায়ে ভারি বুট। ওরা বেশি জলের কাছে যেতে পারছে না। ওরা ওদের ডানদিকে কিছু এগিয়ে গেলেই ঝোপটা দেখতে পেল। এখানে এখন নানা প্রকারের আগাছা। কিছু ওবোংলেঙরার গাছ এবং বিশকাটালির গাছ। সেই গাছের ভিতর কিছু হিজল অথবা শ্যাওড়ার বন অনায়াসেই গজাতে পারে। ওরা টর্চ জ্বেলে দেখতে পারে, এই ভয়ে দিলীপ কোনরকমে নাকটা জলে জাগিয়ে রেখেছে। আর গলুইয়ের দিকটা জলের দিকে রেখেছে। ফলে ওরা যাবার সময় টর্চ মারতেই দেখল, বাতাসে হিজলের ফুল দুলছে। ভারি সুন্দর ফুল। কানের দুল করে দিতে পারলে বিবিকে ভারি খুবসুরত লাগত। এমন কি ওরা টর্চ জ্বেলে দুটো একটা হিজলের ফুল তুলে নিয়ে গেল স্টিক দিয়ে। এবং দিলীপ গলুইয়ের নিচে জলের ভিতর ডুবে ডুবে ইষ্টনাম জপ করল।

ঠিক একে ইষ্টনাম বলা যায় না। ভিতরে তার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সে গলুই থেকে ওটা টেনে বের করে নিলে অনায়াসে ওদের ফেলে দিতে পারত। এতে কাজের কাজ তেমন হবে না। তা ছাড়া তার অধিকারও নেই। তার কাজ শুধু এই কাঠের বাক্সটাকে জায়গা মত পৌঁছে দেওয়া। দিলেই সে আবার অন্য নির্দেশ পাবে। খুশী মত সে যা কিছু ইচ্ছা করতে পারে না। সুতরাং সম্বল ইষ্টনাম। এবং তার তখন মনে হচ্ছে সব আকাশের গ্রহপুঞ্জ যেন তার গলগ্রহ হয়ে আছে। ঘাড় ধরে গেছে। কারণ চিত হয়ে থাকলে আকাশ বাদে আর কিছু দেখা যায় না।

ওরা জলের ভিতর ঢিল ছুঁড়ল। যেখানে আলোটা বৃত্তাকারে স্থির হয়ে আছে ঠিক সেখানে একজন অফিসার মত মানুষ দুবার ঢিল ছুঁড়ল। ঢিল ছুঁড়ে কি যেন পরীক্ষা করছে। জলে ঢিল ছুঁড়লে একটা বৃত্তাকার ঢেউ উঠে চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে ঢেউ লক্ষ্য করা যাচ্ছে

না। কেবল বাতাসের ভিতর বোঝা যাচ্ছে নদীর সেই জলে ওদের কিছু পড়ে গেছে। এবং মনে হল একজন খান সৈন্য উলঙ্গ হয়ে জলে নেমে যাচ্ছে। মানুষটা ডুব দিয়ে কি খুঁজল। জল কম হওয়ারই কথা। গ্রীষ্মের নদীতে জল প্রায় থাকে না বললেই হয়। মজা নদী। জলে পচা গন্ধ। এবং জলের রং নীল। লোকটা কিছু মাটি তুলে পাড়ে উঠে এল। পাড় থেকে আবার খাড়া উতরাই পার হয়ে ওরা ছাউনিতে ঢুকে যেতেই সে জয় বাংলা বলে ঠেলে দিল নৌকাটাকে। সে খুব বোকামী করল কি চালাকের কাজ করল তা টের পাওয়া যাবে পরে। কারণ বৃত্তের মুখে আলোর রশ্মির খানিক অংশে ঝোপটা যে সচল ধরা পড়ে গেছে। সে পাগলের মত নৌকা উত্তরের দিকে টেনে যাচ্ছে। আগে সে ছিল নদীর দক্ষিণ দিকে, এখন উত্তর দিকে। আবার সে কচুরিপানার মত ঝোপের আশ্রয়ে নদীর জলে ভেসে চললে দেখল সে বেশ দূরে এসে গেছে। আলোটা ওকে পিছু পিছু অনুসরণ করছে। দক্ষিণা বাতাস এবং সে নিজে আর পালের মত ঝোপ-জঙ্গল নৌকাটাকে যত দূরে নিয়ে যাচ্ছে তত বেশী ধীর স্থির একটা আলো ওর পিছনে সন্তর্পণে হেঁটে হেঁটে যেন আসছে। ওপর থেকে সেই আলোর এমন লঘু গতি দেখে মনে হল, কিছু করা দরকার। কোনদিক থেকে যে আক্রমণ ঘটবে বোঝা যাচ্ছে না। একবার ভাবল সে ঝোপের ভিতর রাইফেল তুলে বসে থাকে। কিন্তু তার একার পক্ষে এটা অসম্ভব। কারণ, হালে কেউ না থাকলে এলোপাথাড়ি নৌকা ভেসে গিয়ে চড়ায় আটকে যেতে পারে। তার কিছু করণীয় নেই। কেবল দেখা লঘুপক্ষ হয়ে যে আসছে, আলোর ফ্ল্যাসটা ওর দিকে যে আসছে, শুধু দেখা। কি আস্তে আস্তে, কত সহজে, আর যেন জানে না কিছু বোঝে না কিছু এমন এক গতি নিয়ে কাছে চলে আসছে। সে নিরুপায় মানুষের মত যত দ্রুত পারছে নৌকা কেবল টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। আর একটু সময়। ওরা যদি তখন মাঠ ভেঙে নেমে আসে তবে মোকাবেলা করা যাবে।

ততক্ষণে সে ভৈরবতলা ঘাটে আমিনুলকে পেয়ে যাবে। আমিনুলের উপর নৌকার ভার দিয়ে সে মাঠের ভিতর একেবারে লায়িং পোজিসন—একটা ক্রুদ্ধ বাঘের মত সে গর্জে উঠবে। হল্ট্। তারপর বন্দুকের নল থেকে এক দুই ফোঁটায় ঘাসের উপর বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়বে। সে দু হাত পা ছড়িয়ে দুই নদীর পাড়ে গাছের ছায়ায় শুয়ে তার প্রিয় আজন্মকালের কবিতা আবৃত্তি করবে, সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। সে শুয়ে থাকবে তখন, পড়ে থাকবে মাটির কাছাকাছি।

॥ সাত ॥

—তোমার হাত ধরলে আমার কোলে ছাও।

—হাত ধরবে কেন। আমি বেশ নিয়ে হাঁটতে পারছি। বলে মিনু বাচ্চাটাকে কাঁধে ফেলে নিল।

—তুমি কেবল পিছনে পড়ে যাচ্ছ।

—না, এবার ঠিক হাঁটব। ছাখো তোমাদের সঙ্গে কেমন হেঁটে যাচ্ছি।

আবুল বলল, মা তুমি আমার সঙ্গেও হেঁটে পারছ না।

মিনুর যেন বলার ইচ্ছা, না পারছি না বাবা, তোর সঙ্গে আমি কি করে পারি? বলে এক হাত ছেলের চুলের ভিতর ঢুকিয়ে আদর করল। বয়স অনুযায়ী আবুল লম্বা। শরীর এবং মুখ আন্দাজে চোখ বড়। এবং গায়ে মাংস কম বলে মুখটা সব সময় ঢল·ঢল করছে। চুলগুলি বড় এবং কাঁধে এসে পড়েছে। গত ক'মাস থেকেই সাহেব সংসারের প্রতি কেমন উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এটাকে উদাসীনতা বলে না। চোখে-মুখে গাম্ভীর্য, কি হবে হবে ভাব। আওয়ামী লীগের হয়ে সে কাজ করেছে। ছ'দফা দাবির জন্য সে রাত জেগে পোস্টার লিখেছে। ছ'দফা দাবি না মানলে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। আমরা শেষবার চেষ্টা করব অন্তত লাহোর রেজুলেসনকে সম্মান জানাতে। তারপর থেকেই মানুষটা নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে গেল। সময়ই পেত না। এবং সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখত না। মিনুও অন্যমনস্ক ছিল এ-সব ব্যাপারে। আবুলের চুল যে বড় হয়ে গেছে এবং চুল না কাটায় ওর মুখশ্রী যে আরও সুন্দর হয়েছে সেটা যেন আজ সকালে ধরতে পেরে অবাক হয়ে গেল। সে ডেকেছিল, আবুল আয়।

আবুল কাছে এসে বলেছিল, আমাকে ডাকছ মা ?

কাছে এলে ছেলের দিকে খুব নিবিষ্টভাবে তাকিয়েছিল মিনু। সে এখন আর কাঁদে না। মা ও বাবা এবং কিছু আত্মীয়-স্বজন ঢাকায় নিহত হওয়ার খবর পাবার পর থেকেই সে কেমন কঠিন এবং স্থির ধীর। সে আবুলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথার উপর মুখ রেখে বলেছিল, আবুল তোর খুব কষ্ট হবে।

—কিসের কষ্ট মা ?

—আমাদের ধরে নিয়ে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে।

আবুল বুঝতে না পেরে বলেছিল, কারা তোমাদের ধরবে ?

সমসের পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়েছিল সব। যা খবর আসছে তাতে সে জেনেছে ওদের অঞ্চলেও মিলিটারি অপারেশন হবে। এবং যারাই আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত, তাদের হয় হত্যা করা হবে, না হয় ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। সমসের চায় না ছেলে তার ভীত হয়ে পড়ুক। সে ছেলেকে নানাভাবে সাহসী হতে শিক্ষা দিচ্ছে। কিভাবে কালোজীবটাকে ব্যবহার করতে হয় তাও শিখিয়েছে। সে ঘরে ঢুকে চোখ টিপে দিয়েছিল। মিনু আর কিছু বলতে পারেনি। কারণ সবই উড়ো খবর। কেউ কোন সঠিক খবর দিতে পারছে না। কত রকমের খবর যে ক'দিন থেকে আসছিল !

তারপর মিনু জানালায় দাঁড়িয়েছিল ছেলের মাথায় হাত রেখে। কি নরম আর মসৃণ চুল আবুলের। কি ঘন আর কালো। চুলে ভারি সুন্দর তেলের গন্ধটা। ওরা সবাই তেলটা ব্যবহার করে। অথচ আবুলের মাথায় তেলের গন্ধটা যেন আলাদা। যেন আবুল তার সুন্দর নরম শরীর এবং চোখ-মুখ নিয়ে, তেলের গন্ধ নিয়ে, আলাদা মানুষ। সে কতবার রাতে, কত রাতে সমসেরকে বুকের কাছে টেনে নিলে তেলের গন্ধটা পেত। সমসেরের চুল ছোট করে ছাঁটার স্বভাব। ওর মাথায় যে গন্ধটা পায়, আবুলের মাথায় তেমন থাকে না, আবুলের মাথার তেলের গন্ধ কেমন আশ্চর্য এক নদীর জলে ছোট

ছোট কলমিলতার ঘ্রাণের মত। সে আবুলকে কিছুতেই তখন কাছ-ছাড়া করতে পারে না। কেবল মাথায় হাত রেখে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

জানালা থেকেই দেখা যায় মিশনারি—স্কুলের চিলেকোঠা অথবা বড় মাঠ, মাঠে নানারকমের গাছপালা, এবং নানারকম ফুলের সুবাস তার জানালায় বয়ে আনে। বাড়ির পিছনেই নদী, শীতলক্ষ্যা নদীর জলে ছোট-বড় স্টীমার। এবং আবুল আর সে কতদিন ছাদে বসে থেকেছে, লুডো খেলেছে আর নদীর জলে সাদা রঙের স্টীমার, লঞ্চ, বোট, গাদাবোট আর কাঁড়ি কাঁড়ি নাও দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছে। কোনটা ঘাসের, কোনটা আমের অথবা আনারসের। করলা ঝিঙে নিয়ে নাও বোঝাই কত। ছাদে দাঁড়ালে চারপাশের গাছপালা নিয়ে শহরটা বড় আপন জনের মত দাঁড়িয়ে থাকত। মা আর ছেলে কিছুতেই বিকেল হলে ছাদ থেকে নামতে চাইত না। স্কুল থেকে ফিরেই মা আর ছেলেতে ছাদের আলসেতে বসে বাংলাদেশের গান গাইত। কোনদিন কোরাস, আবুল মায়ের সঙ্গে গলা মিলাতে না পারলে লজ্জায় থেমে যেত। তাতে লজ্জা কি! মিনু হাত তুলিয়ে পা তুলিয়ে উৎসাহ দিত, এবং প্রথম থেকে ফের পায়ে তাল দিয়ে গাইত, ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। তা বেশ হয়েছে। ঠিক আছে। এখানে একটা ছোট্ট টান থাকবে বলে 'আমাদেরই' ফের সে উচ্চারণ করে ফিরে ফিরে গাইত। এ-ভাবে কখন সন্ধ্যে হয়ে যেত, চা দিয়ে যেত করলা বুবু। বুবুর উপর ভার সংসারের। করলা বুবু এলে হেসে বলত, ছেলেকে বাংলাদেশের গান শেখাচ্ছি বুবু।

অথবা রাতে সমসের ফিরলে মিনু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখত নিজের মুখ। চোখে সুর্মা টানা এবং কপালে কাঁচপোকার টিপ। নরম পাতলা সিল্কের শাড়ী পরে থাকলে সমসের ভীষণ-ভাবে মিনুকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ভালবাসে। ছেলেটা ও-ঘরে

পড়ছে। একটা পর্দা এবং নীল রঙের পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে মিনু সারা সন্ধ্যাটা খাটে পা তুলে কোন সময় নজরুল আবার কখনও জীবনানন্দ পড়তে পড়তে—রূপসী বাংলা পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যায়। এবং মুখ তুলে তাকালেই সে সহসা দেখতে পায় সমসের এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে।

—তুমি কখন এলে?

—অনেকক্ষণ।

—তুমি আচ্ছা মানুষ বাবা। চুপচাপ চোরের মত দাঁড়িয়ে আছ।

—চোরের মত কোথায় দাঁড়ালাম!

—দাঁড়ালে না। ভয় পেয়ে চীৎকার চেঁচামেচি করলে খুব ভাল হত।

—বারে, আমি যে তোমার আবৃত্তি শুনছিলাম। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।

—তাই বুঝি?

—সত্যি।

—আমাকে খুব গ্যাস দেওয়া হচ্ছে সাহেবের।

—না, গ্যাস না মিনু। তোমাকে কতবার আর বলব, তোমার চোখ দেখলেই আমি বাংলাদেশের মানেটা বুঝতে পারি।

মিনু কোন কথা বলতে পারত না তখন। উঠে বসত। আলনা থেকে বাড়িতে পরার লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবী বের করে দিত। কাছে এলেই দুহাতে জাপ্টে ধরার স্বভাব মানুষটার। কোন কোন দিন দূর থেকে মিনু ছুঁড়ে দিত, কারণ মানুষটা ওর এই শরীরের জন্য পাগল, এবং কাছে গেলেই জড়িয়ে ধরবে, একাকার করে ফেলবে, পাশের ঘরে যে ছেলেটা আছে, পড়ছে, এবং যে-কোন সময় ছুটে আসতে পারে—সে সব আদৌ ভাববে না। একেবারে ছেলেমানুষের মত চুমু খাবার জন্য কেবল আবদার করবে। এই মিনু, এদিকে এস না। এই কি রে! কি হচ্ছে!

মিনুর হাঁটতে হাঁটতে ছোট ছোট ছবি চোখে ভাসছিল। ছোট ছোট ছবির ভিতর একটা মানুষকে কত সুন্দর ভাবে চেনা যায়। এবং এই মানুষই ভোটের দিনগুলিতে একবিন্দু সময় পেত না। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছিল। সাইকেলে কামাল সাহেবের সঙ্গে দূরে দূরে চলে গেছে। ফিরতে রাত হয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত মিনু জেগে রয়েছে জানালায়। ছেলেটা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। শীতের দিন বলে সে ও-ঘরের জানালা বন্ধ করে রাখত। শুধু শীতের জন্য সে একটা র‍্যাপার গায়ে জানালা খুলে অপেক্ষা করত, মিশনারি স্কুলের পথে ওর ক্রিং ক্রিং বেল কখন বাজবে। সে সেই শব্দে ধরতে পারত, সমসের ফিরছে। সদর দিয়ে ঢুকে সাইকেলটা টিনের চালাটায় রেখে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকত। ঢুকেই হাত দুটো লেপ্টে দিত মিনুর গালে। কি ঠাণ্ডা ছাখো।

মিনু বলত, গরম পানিতে হাত-পা ধুয়ে নাও।

সমসের নড়ত না। সে দুহাত মিনুর র‍্যাপারের নিচে রেখে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা হাত দুটো গরম করতে চাইত। মানুষটার এতটুকু দুষ্টুমি করার ইচ্ছা হত না। চুপচাপ হাত দুটো র‍্যাপারের নীচে। মিনু নড়ত না। ওর হাত গরম হবে না ঠিক মত, অথবা এই যে সামান্য সুখ সুখ খেলা ওর ভাল লাগত। শীতে মানুষটার মুখ ফ্যাকাশে। হাত-পা ধুয়ে যত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে তত সে শীত থেকে রক্ষা পাবে, অথচ মানুষটার স্বভাব, এই শীতে দাঁড়িয়ে থেকে একটু যেন কাছাকাছি থাকা। যতটুকু সময় এ-ভাবে দাঁড়িয়ে জানালায় আকাশটা দেখা যায়।

যত হাঁটছিল, যত গ্রাম ভেঙে মাঠে, মাঠ ভেঙে গ্রামে উঠে যাচ্ছিল তত মানুষটার সব রকমের ছবি চোখে ভাসছে। ওর হাতে অথবা কাঁধে বাচ্চাটা আছে, তাকে সে দিয়ে গেল, কোন নিরাপদ জায়গায় ওকে পৌঁছে দিতে হবে। হেঁটে যাবার সময় সেজন্য সে কোন ক্লেশ অনুভব করছে না। পায়ের স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে হাঁটতে হচ্ছে। চাষ করা জমি, জমিতে বড় বড় মাটির ঢেলা, খুব দ্রুত

হাঁটলে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে যেতে পারে। আমিনুল দ্রুত হাঁটতে পারছে না। দ্রুত হাঁটতে না পারলে ক্রোশখানেক আর যে পথ আছে এবং সে-পথে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে দেরী হয়ে যাবে। সে এবার কাছে গিয়ে বলল, ভাবী, আমার কোলে দ্যান।

—তুমি আবার কষ্ট করবে?

—কষ্টের কি দেখলেন?

—বেশ তো ঘুমোচ্ছে। কাঁধে ঘুম যাচ্ছে। সকাল হলে ও টের পাবে—আমরা ওর কেউ নই।

—কে বলেছে আমরা ওর কেউ নই? আমরা কেউ না হলে এমন ভাবে কেউ নিয়ে আসে।

বস্তুত এইটুকুতেই যেন কোথায় একটা মায়া ধরে গেছে। টর্চের আলোতে সে দেখেছে ছোট্ট একটা মেয়ে, হামাগুড়ি দিতে পারে, উঠে দাঁড়াতে পারে—মুখটা একফোঁটা শিশিরের মত, ভোরের বেলা ঘাসের উপর শিশির-বিন্দুটি যেন! সে বুকের কাছে রেখেছে সারাক্ষণ। বুকের কাছে রাখলে কেমন মায়া বেড়ে যায়। প্রাণের কাছে অথবা হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকলে মায়া পড়ে যায়। আমিনুল এখনও এটা টের পাচ্ছে না। একবার বুকের কাছে তুলে নিলেই টের পাবে। এই ভেবে সে যেন ভাবল ওর জন্য সবার ভালবাসা এখন দরকার। সে এটুকু ভেবে আমিনুলের হাতে দেবার সময় দেখল জেগে যাচ্ছে। হাত-পা তুলে ঘুম ভাঙার মত টানা দিতেই সে তাড়াতাড়ি আমিনুলের কাঁধে ওকে থাবড়ে দিতে থাকল।

আমিনুল বলল, এ-সব গ্রামগুলি সব জয় বাংলার। এখানে কারো বাড়িতে ঢুকে রেখে দিলে হয় না?

—এমন তো কথা নেই। সে তাকে এখানে কোথাও রেখে যেতে কিন্তু বলে নি।

যেন কথা মত ওকে পৌঁছে দিতে না পারলে সমসেরকে অপমান করা হবে। এখানে রেখে গেলে সমসের অখুশী হতে পারে। আর

এখন কেন জানি ওকে সে কোথাও রেখেও যেতে পারবে না। কপালে যা আছে হবে। সবার অদৃষ্টের সঙ্গে এই ছোট্ট মেয়েটির অদৃষ্টও বাঁধা আছে এমন সে ভাবল। এবং মিনু আরও যা ভাবল, মেয়েটি বেঁচে গেছে। ওর বাঁচার অদৃষ্ট। কেউ ওকে হয়তো মারতে পারবে না, এটা একটা শুভ ব্যাপার বলেই তার মনে হল। সে হাঁটতে হাঁটতে ঘেমে যাচ্ছে, ঘেমে জবজবে হয়ে গেছে এবং বার বার আঁচল দিয়ে মুখ মুছেও ঘাম শেষ করতে পাবছে না। ওর ক্লান্তি আসছিল। আবুলের পায়ে ফোসকা পড়েছে। সে পা টেনে টেনে হাঁটছে। চাষ করা জমির উপর দিয়ে হাঁটার অভ্যাস নেই বলে সে মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে এবং কখনও আমিনুল ওকে কাঁধে নিয়ে হাঁটছে। রাত, নির্জনতা, পাখির ডাক অথবা ব্যাঙের ক্লপ ক্লপ শব্দ ওদের মাঝে মাঝে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। গ্রামগুলোতে কেউ জেগে নেই। এমন কি সামনের গ্রামে ওরা একটা আলো পর্যন্ত জ্বলতে দেখল না। কেবল খোলা আকাশ এবং খোলা মাঠ। অস্পষ্ট আল-পথ। ওরা অনন্ত কাল ধরে যেন হাঁটছে। পথ আর শেষ হচ্ছে না।

আমিনুল বলল, আমরা আইসা পড়ছি। বড় অর্জুন গাছটা দ্যাখা যাইতেছে।

আবুল বলল, কোন দিকে চাচা?

—ঐ যে দ্যাখা যায় না, একটা লম্বা গাছ আসমানের দিকে উইঠা গ্যাছে।

আবুল দেখল, সত্যি একটা বড় লম্বা গাছ আসমানের দিকে উঠে গেছে। এবং তার উপর অদ্ভুত এক সবুজ নক্ষত্র জ্বলছে।

মিনু বলল, আবুল আমাদের সেখানে পৌঁছাতে হবে।

আবুল মা-র পাশে পাশে হাঁটছে। সে দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছে। সে কিছুতেই পিছনে পড়ে থাকবে না। সবার আগে সে যেতে চাইছে। যেতে যেতে বলল, বাবা আসবে না মা? বাবা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে না?

মিনু বলল না আবুল। কারণ আবুল জানে না, ঠিক বোঝে না সব। বাবা ওদের ফেলে কোথাও চলে যবে সে বিশ্বাস করতে পারে না। ওর বিশ্বাস সেখানে গেলে সে দেখতে পাবে, বাবা তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। দেখলেই বলবে, তোদের এত দেরী? কোথাও কেউ আটকে ছিল? কোন কষ্ট হয় নি তো?

যত কষ্টই হোক, মা কিছু বলবে না। পাশাপাশি সবাই বসবে। দিলীপচাচা নৌকাটা নিয়ে এলে আবার তারা উঠে পড়বে। সঙ্গে বাবা থাকলে কেন জানি তার কোন ভয় থাকে না।

গাছটার নিচে মনে হল দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আমিনুলই এটা প্রথম লক্ষ্য করল। এটা ভৈরবতলা ঘাট। আর কিছু দূরে ললিত সাধুর আশ্রম। এবং মাঝখানে লক্ষ্মণ সাধুর মঠ। দুটো টিনের ঘরের ফাঁকে ওরা। গঞ্জের মত জায়গা। চালাঘরটা পার হলেই ছোট্ট একটা মসজিদ। মসজিদের গম্বুজে লাল-নীল পাথর। অন্ধকারে পাথর-গুলো চক চক করছে। মসজিদের ডান দিকে পুরনো পাঁচিল। আমিনুল মিনু ভাবীর হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। আবুলের পথ আগলে ফিস ফিস গলায় বলল, বইসা পড়েন। মানুষ গাছের নিচে।

ওরা তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে বসে পড়ল। একেবার পাঁচিল ঘেঁষে। এখানে খুব জোর একজন মানুষের থাকবার কথা। দিলীপ আগে চলে এলে সে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে পা র। কিন্তু দুজনের দাঁড়িয়ে থাকার কোন হেতু খুঁজে পেল না। পিছনে শত্রুর চর লাগতে পারে। সে ধীরে ধীরে পাঁচিলের ও-পাশ থেকে মাথা তুলে দেখতে থাকল। ওরা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিড়ি অথবা সিগারেট খাচ্ছে। অন্ধকারে সিগারেটের আগুনটা জ্বলছে। এবং অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। যদিও সে-ই এখন কমাণ্ডের অধিকারী, তবু কেন জানি মিনু ভাবীকে তার খুব বুদ্ধিমতী মনে হয় এবং ওর পরামর্শ মত কাজ করতে পারলে অথবা রিস্ক নেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

—সে ফিসফিসে গলায় ডাকল, ভাবী।

—বল।

—কি করবেন?

—এগিয়ে গেলে হয় না?

—কিন্তু…

—যদি ওরা আমাদের লোক হয়?

—আমাদের লোক তো থাকার কথা না এ-ভাবে।

—কে কোথায় থাকবে আমরা তো সব জানি না।

আমিনুল কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, আমরা যে এখানে আইসা অপেক্ষা করমু সেটা তো জানার কথা না। কেউ জানব না। খাড়ির মুখে সব ঠিক হইল।

মিনুর মুখটা এবার অন্ধকারেই কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এবং এতক্ষণে তার মনে হল, একমাত্র দিলীপ, সে এবং আমিনুল জানে ওরা ভৈরবতলা ঘাটে এসে অপেক্ষা করবে। আর কেউ জানে না। তবে এরা কারা?

আমিনুল লুঙ্গিটা শক্ত করে নিল। সে বলল, আপনেরা বসেন। আমি ফিরা না আসা পর্যন্ত কোনখানে যাইবেন না।

আমিনুল এই বলে পাঁচিলের পাশ থেকেই হামাগুঁড়ি দিতে থাকল। ওকে পূবদিকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। সে উঠে দাঁড়ালেই পাঁচিলের উপর ওর বুক-মাথা দেখা যাবে। এবং এ-সময় কে কি ভাবে যে বুলেটে বিদ্ধ করছে টের পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে উঠে গ্রামের মানুষেরা দেখছে রাস্তায় পড়ে দশজনের লাস। অথবা নদীর পারে কারা পাঁচজন খান সৈন্য মেরে রেখে গেছে। সৈন্যরা মারা পড়লেই পাশাপাশি পাড়াকে পাড়া গ্রামকে গ্রাম খালি হয়ে যাচ্ছে। কারণ সৈন্যরা এসে আগুন দেবে ঘরে ঘরে, লুটপাট করবে। এবং সামনে যা পাবে, মানুষ কুকুর সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যাবে। সুতরাং এমন যখন সময়, তখন সন্তর্পণে যাওয়াই ভাল। চারপাশটা

লক্ষ্য করে যাওয়া ভাল। সে পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে নিল। এবং পিছন থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখন একজন আবার একটু সরে দাঁড়াল। ওকে কি ওরা দেখতে পেয়েছে। আমিনুল একেবারে ঘাসের ভিতর ডুবে থাকার মত মাটির সঙ্গে মিশে আছে। এবং কচ্ছপের মত মাঝে মাঝে গলা তুলে দেখছে। তারপর আবার দু-লাফে কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। যে মানুষটা সরে দাঁড়িয়েছিল সে এখন গাছে হেলান দিয়ে গুন গুন করে কি একটা গান গাইছে। আমিনুল কান পেতে গানটা শোনার চেষ্টা করল। কিছুই বুঝতে পারছে না। হাওয়ায় গানটা ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এবং মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে কে যেন গাইছে। সুর তাল লয় খুব অস্পষ্ট। সে তবু যেন গানের সুরে বাংলাদেশের কথা খুঁজে পেল। এবং মনে দুটো সাইকেল গাছের কাণ্ডে আড়াআড়ি করে রাখা। এবং আরও কাছে গেলে সে দেখল ওদের কাঁধে রাইফেল। সে পিছনে, গাছেব এ-পাশে, ওরা সামনে, গাছের অন্য পাশে। সে তবু লাফ দিয়ে উঠে রিভলবারের পয়েণ্টে বলল, সজনে ফুল।

ওরা বলল, সজনে ফুল। তিন নম্বর কুটির।

আমিনুল বলল, সজনে ফুল. তিন নম্বর কুটির, তালপাতার পাখা।

তারপর ওরা গলা জড়িয়ে তিনজন মিলে আলিঙ্গন করল। আমিনুল বলল, আমার নাম আমিনুল।

—আমার নাম কবিরুল ইসলাম।

—আমি আবদুল মাতিন।

ওরা বলল, ভাবী কোথায় ?

—আসেন আমার লগে।

কবিরুল বলল, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। খুব বিপদ।

আমিনুল কেমন সহসা পেছন ফিরে তাকাল। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো চক চক করছে।

—দিলীপ নৌকায় পড়ে। ওর বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছে।

আমিনুল ছুটে ভাবীকে এসে বলল, খুব বিপদ ভাবী। তাড়াতাড়ি আসেন। ওরা আমাগ লোক। ভয় নাই। সমসের ভাই অগ পাঠাইয়া দিছে।

ওরা কারা সে জানার আর কোন উৎসাহ থাকল না। দিলীপের বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছে। সে কোথায়.? আবুলের হাত ধরে, মেয়েটাকে কাঁধে ফেলে, সে ওদের সঙ্গে নদীর চর ভেঙে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকল। এখন কোন প্রশ্ন করতে পারছে না। মিন্নুর মনেও নানারকম ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন এসে উঁকি মারছে। ওদের সঙ্গে দিলীপের কি ভাবে দেখা? দিলীপ কোথায়? ওরা কিভাবে জানল, তারা এখানে আছে? সাবির যদি পাহারায় থাকে, সাবিরের নাম সে আগেও শুনেছে। সে ই, পি, আর-এর লোক। সে এক নম্বর মার্কসম্যান। এবং যারা যারা সময় মত স্বাধীনতা ঘোষণা হলে রাইফেল নিয়ে ফ্রন্টে যাবে কথা ছিল, সে জানে সাবির তাদের ভিতর একজন। সেই সাবির আছে দিলীপের পাশে।

মিন্নুর চোখদুটো নানাকারণে শুকিয়ে যাচ্ছে। এবং বাচ্চাটাকে আমিনুলের কোলে দিয়ে দিয়েছে। সবার সঙ্গে দ্রুত ছোটার জন্য কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে নিয়েছিল। সে যে কারুর চেয়ে কম ছুটতে পারে না, এখন সেটা ওর ছুটে যাওয়া দেখে বোঝা যাবে। প্রায়, দূরে ঠিক ললিত সাধুর আশ্রমের পাশে একটা আমগাছের নিচে নৌকাটা। ওরা বুঝতে পারল, নৌকার পাটাতনে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে সে সাবির। ওর হাতে রাইফেল। এবং অন্ধকারেও বেয়নেট চক্ চক্ করছে!

মিন্নু জল ভেঙে নৌকায় উঠে গেল। ওর শাড়ি ভিজে গেছে। পায়ে জল-কাদা। আর বাকি যারা ছিল তারাও লাফ মেরে উঠে গেছে। দিলীপ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। টর্চ জ্বেলে মিন্নু দেখল চুল এবং ঘাড়ের নিচে জবজবে রক্ত। পাটাতনটা রক্তে ভেসে গেছে। আমিনুল নৌকা ভাসিয়ে দিল। যে সব হিজলের ডাল ছিল সেই সব

ডাল আহত অবস্থায় ফেলে দিয়ে নৌকা হাল্কা করে নিয়েছিল। সে প্রায় চলে এসেছিল। সে বলল, বৌদি আর ইট্টুর লাইগা—। বলেই তার গলা থেকে একটা কষ্টকর আওয়াজ ফুটে বের হচ্ছে। কথাটা সে প্রকাশ করতে পারছে না। মিনু বৌদির দিকে সে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে।

মিনু পুঁটলি থেকে কাপড় বের করে ঘাড়ের কাছে যে চাপ চাপ রক্ত তা মুছে দিচ্ছে। ক্ষত স্থানটা দেখা যায় টর্চ মারলে, মাংস খাবলা খাবলা উঠে গেছে, এবং এভাবে ওকে ওদের বহন করে নিয়ে যেতে হবে। সাবির ছইয়ে হেলান দিয়ে আছে। সে বলল, নৌকা থেকে পালাতে চাইছে ও। বলছে, ও থাকলে আমরা বিপদে পড়ে যাব।

দিলীপ এখন তেমন কথা বলতে পারছে না। ওর কষ্ট হচ্ছে খুব। সে দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে কষ্টটা দমন করতে চাইছে। ওর চোখের উপর মায়ের মুখটা ভাসছে। মা সজনে গাছের নিচে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। অফিস থেকে দেরি করে ফিরলে মা রাস্তায় এসে দাঁড়াতেন। এবং উদ্বিগ্ন চোখে অপেক্ষা করতেন। এই চোখই সে এখন কেবল দেখতে পাচ্ছে। আর যা শুনতে পাচ্ছে—একটা শব্দ, যেন অনেক দূর থেকে ছোট্ট নাবালিকার মত ডাকটা নদীর চরে লাফিয়ে লাফিয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে। নদীর চরে সে-ও ছুটছে। সে ডাকটা শুনবে না, শুনতে না পায় এ-জন্য কেবল ছুটছে। কে ডাকছে …দা…দা…রে।

মিনু মুখ কাছে নিয়ে বলল, তুমি কিছু বলবে? তোমাকে পাশ ফিরিয়ে দিচ্ছি। ওর যা কিছু সম্বল, এই যেমন ব্যাণ্ডেজ তুলো সবই পুঁটলির ভিতর রাখা আছে, তালপাতার পাখার মতই এক অদৃশ্য স্থান থেকে খুলে, সব মুছে একটা ব্যাণ্ডেজের মত করে দিল মিনু। রক্ত মুখে দিয়ে ওকে ধরাধরি করে ছইয়ের ভিতর নিয়ে গেল। এখানে কোন ভয় নেই। নদীর জল এখানে তত কম নয়। কচুরিপানার ভিড় নেই তেমন। শুধু মাঝে মাঝে নদীর জলে বড় বড় নাও ভেসে গেলে ওরা

চুপচাপ থাকছে। এবং ওরা এবার আর একটা চৌকি, চৌকিটা পার হয়ে যেতে পারলেই মোটামুটি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাবে। এবং হাসিমের বাড়ি, আর ওদের চারটা টিন কাঠের ঘর, ঘরের মেঝেতে সব রাখা হবে। ট্রেঞ্চ কেটে ঘরের ভিতর সব রাখা হবে। এ-ভাবে এই পুরোপুরি অঞ্চলটা ওদের আয়ত্তে এলে স্বাধীন বাংলাদেশের কাছে খবর যাবে নতুন আর একটা মুক্তাঞ্চল তৈরি হয়েছে। কোন ঘরের শত্রু বিভীষণ সেখানে রাখতে দেওয়া হবে না। দিলীপকে শুইয়ে দেওয়ার সময় মিনু কত কিছু যে ভাবছে। যেন সে এক নতুন বাংলাদেশের, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আকুল হয়ে উঠছে! সে তখন ডাকল, আবুল ভিতরে আয়। দিলীপচাচার মাথায় হাত বুলিয়ে দে।

আবুল এতক্ষণ একবারও চাচার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। চাচা রক্তের ভিতর ডুবে ছিল। এবং মা নানাভাবে চাচাকে সাফ-সোফ করেছে। মনে হয় গুলিটা বের হয়ে গেছে। ভিতরে কিছু নেই। সে মনে মনে এমন ভাবলে শুনতে পেয়েছিল, কিছু বলা যাচ্ছে না, আমরা সেখানে না গেলে কিছুই বলতে পারব না। ডাক্তার না দেখালে কিছু বলা যাবে না। ওতেই সে দমে গিয়েছিল। ওর কেবল এখন বাবার মুখটা চোখে ভাসছে। বাবার জ্বর। বাবা এখন কেমন আছে? সে দিলীপচাচার শিয়রে বসে মাকে বলল, মা বাবা কেমন আছে?

মিনু কিছু না জেনেই বলল, ভাল আছে। মনটা কেমন খচ্ করে উঠলে সে কবিরুলকে বলল, কেমন আছে ও? কবিরুল এখন নৌকা বাইছে বলে মিনু ভাবী কী বলছে শুনতে পাচ্ছে না। সে বলল, ভাবী আমাকে কিছু বললেন?

—ওর শরীরে জ্বর ছিল। আসার সময় ওকে কেমন দেখে এলেন?

—ভাল! জ্বর নেই মনে হল, থাকলেও বলতে পারব না। কারণ আমরা যখন গেছি তখন তিনি কি একটা বই পড়ছিলেন।

. মিনু এই শুনে কি ভাবল, তারপর বলল—আপনারা টের পেলেন কি করে আমরা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি?

—পথটা তো আমাদের জানা। কোন পথে আপনারা আলিপুরার দিকে যাচ্ছেন সে তো সমসের ভাই বলেই দিয়েছে। কিন্তু অবাক, সাইকেলে এসে দেখছি সেই ঘাসি নাওটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। খাড়ির মুখে যাওয়া যায় না। দূরে দাঁড়িয়ে নদীর পাড়ে দেখলাম শুধু সার্চলাইট ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখছে। আমরা মোগরাপাড়ার পথ ধরে সোজা নদীর পাড়ে পাড়ে টর্চ মেরে যাচ্ছি। খাড়ির মুখে সমসের ভাই যেতে বারণ করে দিয়েছে। এ পারে এলে সব দেখা যাবে। কিন্তু না নৌকা, না কোন চিহ্ন। কেবল দেখছি নদীর জলে একটা ঝোপ ভেসে ভেসে চলে আসছে। খুব অবাক লাগল। টর্চ মেরে ঝোপটা দেখলাম। কবিরুল এই বলে লগি থেকে বেশি জল নামছে বলে হাত পা এবং জামা ভিজে যাচ্ছে, সে জামাটা খুলে ফেলল। এবং ঢিল মেরে ছইয়ের উপর জামাটা ফেলে রাখল। খুব একটা কৌতূহল। তারপরই দেখি একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের টর্চ মারা দেখে ঝোপের ভিতর ফের সে বসে পড়ল। কি করি আর। আমরা নদীর পাড়ে পাড়ে ঝোপটার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল মেরে চললাম। বাতাসে এবং স্রোতে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। বেশ লাগছিল ব্যাপারটা। এবং অন্ধকারেই মনে হল, আবার সেই মানুষ দাঁড়িয়ে হিজলের ডাল, শেওড়ার ডাল পাতা এবং ঘাস যা কিছু ছিল ঝোপের মত, টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছে। এবং আমরা তখন হাঁকলাম, সজনে ফুল।

খুব ক্ষীণ গলায় আওয়াজ, সজনে ফুল, তিন নম্বর কুটির।

আমরা বললাম, সজনে ফুল, তিন নম্বর কুটির, তালপাতার পাখা।

সে চিৎকার করে উঠল, জয়-বাংলা। আমি দিলীপ। তোমরা কে আছ, নৌকায় উঠে এস। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

সাবির বলল, সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল ফেলে জলে ঝাঁপ। আমি

নৌকায় উঠে গেলাম। নৌকা পাড়ে নিয়ে গেলাম। ওরা উঠে এল। সাইকেল তুলে নিলাম।

—তারপর? আবুল বড় আগ্রহে শুনছে।

মাতিন বলল, তারপর নৌকা ললিত সাধুর আশ্রমের পাশে রেখে দিলীপের কথা মত তোমাদের খুঁজতে অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

ওরা আর কি বলবে, দিলীপ জানে। এখন পাশ ফিরে শুয়ে আছে সে। রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। ব্যাণ্ডেজ ভিজে। কিন্তু সে শুনতে পাচ্ছে সেই ডাকটা। ক্রমে বড় কাছে এগিয়ে আসছে …দা…দা…রে! ওদের কথা অথবা নদীর জলে ঢেউ এবং তার শব্দ কিছুই এখন তার কানে আসছে না। সে ক্রমান্বয় সেই দ্রুত শব্দের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে—দা-দা-রে।

॥ আট ॥

মেহের, অরুণ, আবেদালি, ফিরোজ কাঁধে রাইফেল ফেলে মসজিদের পাশে যে জামরুল গাছটা আছে তার নিচে এসে দাঁড়াল। সমসের দেখল পাঁচটা সাইকেল গাছের নিচে দাঁড় করানো। একটা সাইকেল ময়নার। ময়না এখনও আসে নি। নান্নু মিঞা হুঁকা হাতেই দাঁড়িয়ে আছে গাছটার নিচে। মসজিদের বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেছে নান্নু মিঞার ছোটছেলে। ওদের রওনা করে দিয়েই সমসেরকে নিয়ে সাইকেলে পাশাপাশি গ্রামগুলো ঘুরে বেড়ানো। ঘণ্টাখানেকের কাজ। কোথায় কার বাড়িতে কি ভাবে দুর্গ তৈরি হয়েছে, ঘুরে ঘুরে সে-সব দেখাবে সমসেরকে। তারপর একটা লম্বা বিছানা করে দেবে বৈঠকখানায়। সেখানে সমসের লম্বা হয়ে ঘুম যাবে।

নান্নু মিঞা সমসেরের মুখ দেখেই টের পেয়েছে, বড় শুকনো চোখ-মুখ। অনেকদিন ধরে না ঘুমোলে এমন হয়। চোখ-মুখ বসে গেছে। এবং ওর মনে হল, মানুষটা বোধহয় সময়ই পাচ্ছে না বিশ্রামের। ওর ইচ্ছা ছিল সকাল হলেই সব দেখাবে। কিন্তু খেতে বসে কথায় কথায় সমসের বলেছে, ওরা চলে গেলে ওকে নিয়ে সে একটু সাইকেলে ঘুরে ঘুরে দেখবে।

নান্নু মিঞা বলেছিল, সাহেব আপনার শরীর তো ভাল দেখাইতেছে না।

—আমি ভাল আছি মিঞা সাব।

—কাল সকালে দেখালে চলত না?

—সকালে সময় পাব কি না বলতে পারি না।

—আবার কোথায় যাবেন?

—কি খবর আসবে কে বলতে পারে মিঞা সাব। কাল কি হবে, আপনি আমি কেউ কিছু বলতে পারি না।

নান্নু মিঞা আর তর্ক করে নি। বেশ, যখন যাইতে চান যাইবেন। আগে মেহের ফিরোজ গ রওনা কইরা দেই। তারপরে আপনেরে নিয়া যামু।

ফিরোজ বলেছিল, ভাইসাব আপনার চোখ বসে গেছে। আজ রাতে আর না বের হলেন।

অরুণ বলেছিল, আমার কাছে এ-অঞ্চলের একটা মানচিত্র আছে, গ্রামের নাম, মৌজা এবং সব আছে। কত নম্বর মৌজায় কে কেমন ভাবে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তার একটা লিস্ট আছে।

সমসের চশমাটা খুলে অরুণের মুখ দেখেছিল। তারপর বলেছিল, সব রেখে যা। সময় মত আমি সব দেখে নেব।

অরুণ বলেছিল, কামাল সাহেবের খবর কি?

—কোন খরই জানি না। ওর খবর বোধহয় আমাদের এখন রাখার নিয়ম নেই।

কামাল সাহেবের খবর এখন রাখতে নেই, অর্থাৎ কে কোথায় থাকবে, কিভাবে সে দিনযাপন করবে—এসব খবর রাখা এদের ঠিক না। কারণ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে খান সৈন্যরা। অমন অনেককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুতরাং অরুণ কামাল সাহেব সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করতে পারল না। কামাল সাহেবকে সে এ অঞ্চলে নিয়ে এসে ভোটের আগে মিটিং করেছিল। সাত-আট দিন ছিল ওর সঙ্গে। ওর বাড়িতেই সে থেকেছে। এবং সাত-আট দিনেই মানুষটা এমন জাদু জানে যে সবাইকে প্রাণের চেয়ে আপন করে ফেলেছিল। সমসের সে সময় কামাল সাহেবের সঙ্গে আসতে পারে নি। সে কামাল সাহেবের নির্দেশে কালীগঞ্জের দিকে মিটিং করতে গিয়েছিল। কামাল, সে এবং সমসের থাকলে সে দিনগুলো হয়তো আরও বেশি উত্তেজনাপূর্ণ হত। অরুণ এমন ভেবে চোখ তুলতেই দেখেছি,

সমসের কাঁচের প্লেটে হাত ধুয়ে উঠে পড়ছে। চশমাটা সে রুমালে মুছে চোখে দিচ্ছে। ওর চশমা চোখে না থাকলে ভাল দেখতে পায় না। চশমা খুলে দেখলেই অরুণের মনে হয় সমসের ওকে দেখছে না। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। মুখ না দেখলেই চেনা যায় না। চেনা না গেলে সমসেরকে ভারি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ মনে হয়। এবং তখন অরুণ আর কথা বলতে পারে না।

অরুণ নারাণগঞ্জে ঢাকার কাছে থাকত। কালীরাজারে থাকত সে। ওরা এক স্কুলে পড়ত। কলেজে পড়ত একসঙ্গে। এবং মিনুর সঙ্গে ভালবাসাবাসির সময় অরুণ ছিল তার নিত্যসঙ্গী। আর কতদিন সে অরুণকে নিয়ে মিনুর সঙ্গে মিশনারি স্কুলের বড় দেয়ালের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে। ওরা ঘাসের উপর বসে নানারকমের গাছপালা দেখতে দেখতে নদীর জল দেখতে পেত। চাষী মানুষের মুখ উঁকি মারত ওদের মনে। কোথায় যেন ওরা এক অতীব হীনমান্যতায় ভুগে বলে উঠত, এভাবে একটা জাতি বাঁচে না। কে বলবে তখন সমসের এসেছে অভিসারে। সঙ্গে অরুণ থাকছে সাহস দেবার জন্য। নাকি সমসের এবং মিনুর মধ্যস্থতায় অরুণ থাকছে। মান-অভিমানের ব্যাপারটা বেশীদূর গড়ালেই অরুণের ডাক পড়ত। —কি করি বল তো? মিনু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। চাকরি-বাকরি কিছু করছি না, হুম করে একটা কিছু করে বসলেই হয় না!— এমন কথাই ছিল চিরাচরিতের কথা। কিন্তু আশ্চর্য, অরুণকে দেখলেই মিনু বুঝতে পারত সালিশির জন্য আসছে। মিনু তখন সমসেরের ভীরুতার কথা ভেবে হা হা করে হেসে উঠত। তারপর ওরা ভুলেই যেত কেন এসেছে। ওরা এসেছে বুঝি একটা নতুন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। ওদের কথাবার্তা শুনলে তখন এমনই মনে হত।

সুতরাং অরুণ সমসেরকে ভালভাবে জানে বলেই আর কিছু বলে নি। এখন এমন সময় নয় যে শ্লেক দিয়ে বলবে, না, যাবে না। কারণ সে এখন সমসেরের আজ্ঞাবহ। ফ্রণ্টে বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই,

তার দাবীও সামান্য। সমসের চশমা খুলে তাকালেই অরুণ আর কিছু বলতে পারে নি।

ময়না যখন এল, তাকে আর চেনা গেল না। ময়নাকে ওরা একটা সবুজ রঙের ইউনিফরম পরিয়ে নিয়েছে। মাথায় হেলমেট। পিঠে কিড্ব্যাগ। এবং কাঁধে রাইফেল। পায়ে বুটজুতো। ওর মুখ দেখলে এখন শুধু মনে হয় এক তরুণ যাচ্ছে যুদ্ধ করতে। চোখ বড় বড়। এবং সজীব চোখে নীল রঙের ভালবাসা। কোমল, অতীব এক সৌন্দর্য নিয়ে মেয়েটা মুক্তি যোদ্ধা হয়ে গেছে।

সমসের ময়নাকে দেখলেই যেন কেমন একটা সাহস পায়। স্বামী নেই। একা। এবং একা বলেই যেন সে মুক্ত। এমন মুক্ত যে সে আর দশটা পুরুষের চেয়ে কোন ব্যাপারে কম যায় না। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য। সারা বিকেল খেটেছে। যাদের আসার কথা তাদের জন্য খাবার তৈরী করেছে। সকাল বেলা নানুমিঞার দ্বিতীয় পক্ষের বিবি বলেছিল, ঘুম গেলে হয়। ময়না ঘুমোয় নি। ঘুমানো দরকার। বিশ্রামের দরকার। তবু মেহের এবং অরুণের ইচ্ছার কথা ভেবে, ঠিক ওদের ইচ্ছার কথা ভেবে বোধহয় সমসের এতটা করেনি, এখন মনে মনে সেটা সে টের পাচ্ছে। আবুল, মিনু, বেশি করে মিনুর কথা ভেবেই সে যেন ময়নাকে ওদের সঙ্গে পাঠাচ্ছে। নদী জলে অথবা খেয়াঘাটে যে সব ছাউনি পড়েছে তার ব্যূহ ভেদ করে আসা এক ভীষণ কঠিন ব্যাপার। এবং দন্দির পাশ দিয়ে যে নদী গেছে সেখানে জল কম, উজানে তবু জল থাকে, ভাটার সময় কাদামাটি, বিশাল বিলেন অঞ্চল। জ্যোৎস্নায় মনে হয় সেই বিলেন কাদামাটি শক্ত পাথুরে জায়গা। গরু ছাগল মানুষ কখনও বুক পর্যন্ত কাদায় আটকে পড়ে থাকলে এক হৈ-চৈ। এমন একটা জায়গাতেই ওরা ওদের রাইফেল খালাস করার জায়গা ঠিক করেছে।

ময়না এসেই ওর সাইকেলের চাকায় হাওয়া কেমন আছে দেখে নিল। সে নুয়ে দেখছিল বলে চুলের বেণীটা নিচে পড়ে গেছে। সমসের

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিরোজকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছে। ওখানে হাসেম আছে। প্রথম ওদের বাড়িতেই ওগুলো উঠে যাবে। ওদের একটা মুলিবাঁশের ঘর আছে। এবং পাটকাঠির মাচা আছে। সেই মাচার ভিতর এবং বাঁশের ভিতর গুঁজে রাখা হবে। তা ছাড়া ওরা আসতে দেরি করলে এবং বেলা হয়ে গেলে বসে না থেকে, ময়নাকে অরুণের কাছে রেখে ফিরোজ মেহের যেন চলে যায় গড়িপরদির মাঠের পাশে যে বড় বটগাছটা আছে এবং ভাঙা পোড়ো মন্দির আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে নদী বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে দুদিকের অনেকটা নদী জুড়ে সব দেখা যায়।

ময়না উঠে বেণী দুটো মাথার উপর গোল করে বেঁধে নিল। তারপর মাথায় টুপি চড়িয়ে ফল-ইনে দাঁড়াবার মত ছুটে গেল। মেহের হুইশেল বাজাচ্ছে। হুইশেল বাজালেই যে যার মত লাইনে ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে গেল। সমসের ওদের দেখে দেখে যাচ্ছে। পিছনে নান্নু মিঞা এবং হাতে তার হ্যারিকেন। সে হ্যারিকেনটা উপরে তুলে ধরলে, আলোর মুখে সমসের সবাইকে এক এক করে দেখতে পাচ্ছে। কঠিন মুখ। তবু কেন জানি ময়নার কাছে এসে মনে হল, এই মুখ কোমল এবং এত নীরিহ যে ভয় পেলে সব ভেস্তে যাবে। সে ময়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, কি রে, ভয় পাবি না তো?

ময়না হাসল সামান্য। এই হাসিটুকু সমসেরের কাছে কঠিন প্রতিজ্ঞার মত মনে হয়েছে। সে দেখল অরুণ একটা নীল রঙের প্যান্ট পরে আছে এবং ছাই রঙের হাওয়াই শার্ট। ওর পায়ে চপ্পল। একমাত্র মেহেরের শরীরে ই. পি. আর-এর পোশাক। ফিরোজ পায়জামা পরেছে। এবং কালো রঙের শার্ট। সাদা রঙের পায়জামা পরা ঠিক না। সে মেহেরের দিকে তাকাল। হ্যাঁরে মেহের, তুই ওকে নিয়ে যাচ্ছিস, তোর সব দেখে-শুনে নেওয়া উচিত।

কোথাও ত্রুটি ঘটে গেছে ভেবেই সে উদ্বিগ্ন মুখ-চোখে তাকাল। সে দেখছে সমসের ভাই ফিরোজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এবং

সাদা রঙ যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক না, দূর থেকে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। সে বলল, তাঁড়াতাড়ি আমরা বের হয়ে পড়েছিলাম।

এবং তখনই নামু মিঞার ছোটছেলে দৌড়ে একটা খোপ-কাটা কাপঁড়ের পাজামা নিয়ে এলে ওরা প্রস্তুত হয়ে গেল। সেই পাগল যে প্রতিদিন মসজিদে মোমবাতি জ্বালায়, যে গান গায় অফুরন্ত এবং মাঝে মাঝে যে দুহাত উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পীর মুর্শিদের কাছে দোয়া ভিক্ষা করে, সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে গাছের নিচে। সে বসবে ক্যারিয়ারে। ওকে কিছুটা পথ টেনে নিয়ে যাবে অরুণ, কিছুটা পথ মেহের এবং বাকি পথটা আবেদালি। ওকে ওরা দন্দির বাজারে ওঠার মুখে বড় পাঁচটা তালগাছ জড়াজড়ি করে আছে যেখানে, তার নিচে ছেড়ে দেবে।

তারপর পাঁচটা সাইকেলে ওরা চেপে বসার আগে গান গাইল—পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে / আলোকে আলোকময় / জয় জয় জয় জয় বাংলা জয়। হ্যারিকেনের মৃদু আলো এবং অন্ধকারে জোনাকিপোকা অথবা মসজিদের গম্বুজে লাল-নীল নক্ষত্রের ছবি ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় এবং মাঠের অন্ধকারে ওরা হারিয়ে গেল। ওদের গলার স্বর আর চেনা যাচ্ছে না। যেন ঘাস ফুল পাখি মিলে এক জগৎ এবং সূর্য উঠলে, নদীর জলে পাখি উড়লে, বাংলাদেশকে ঠিক ঠিক চেনা যায়। সে মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই সব শুনতে শুনতে সব ভীরুতা থেকে কেমন মুক্ত হয়ে গেল। তাকে মাঝে মাঝে যে ভীরুতা এসে আক্রমণ করে এবং মাঝে মাঝে সে যে ভাবে মিনু এবং আবুলকে নিয়ে সীমান্তের ওপারে চলে যাবে—ওদের চলে যাওয়া দেখে কেমন সেটা অর্থহীন মনে হয়। সে কোথায় যাবে, বাংলাদেশকে ছেড়ে সে আর কোথায় যেতে পারে!

॥ নয় ॥

কবিরুল খালি গায়ে নৌকা বাইছে। সামনে বেশিদূরে আর লগি মেরে যাওয়া যাবে না। বরং গুন টেনে নিলে তাড়াতাড়ি হবে। মাতিন পাড়ে পাড়ে যাচ্ছে। ওর কাঁধে রাইফেল। এ-অঞ্চলে এখনও কোন আক্রমণ ঘটেনি। চারপাশে বেশ নির্জ্জনতা। তবু সাবধানে যাওয়া ভাল। সে চারপাশটা দেখে আগে আগে যাচ্ছে। সাইকেলটা সঙ্গে নিয়েছে! সে একটু আগে থাকলে সুবিধা, কোন সন্দেহ দেখা দিলেই দ্রুত সে পিছনে ফিরে নৌকায় খবর দেবে।

মিনু তখন নৌকার ভিতর একপাশে আবুলকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। সে প্রথম আবুলকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলেছিল, কিন্তু আবুল দিলীপ-চাচার পাশে রয়েছে। আবুল নড়ছিল না। সাবির ছইয়ের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাঝে মাঝে কবিরুলের কষ্ট হলে তাকে সাহায্য করছে। সাবিরই বলেছিল, ভাবী বসে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন। একটু ঘুমিয়ে নিন।

সবাই জেগে আছে, সে ঘুমোয় কি করে! লজ্জায় মিনু বলেছে, ঘুম আসে, বল?

—তবু একটু চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমাদের পালা করে একটু জিরিয়ে না নিলে চলবে কি করে?

কথাটা ঠিক। এ-ভাবে সবাই জেগে বসে থাকলে হবে কি করে? মিনুর ঘুম আসার কথা নয়। সে আবুলকে পাশে নিয়ে শুলো। ঠিক মাথার কাছে আর একজন মানুষ। কোন রা করছে না। শুয়ে থেকেই সে মাঝে মাঝে ডাকছে, দিলীপবাবু, কিছু কষ্ট হচ্ছে?

দিলীপ খুব ক্ষীণ গলায় কথা বলছে, না। কোন কষ্ট হচ্ছে না। বোধহয় আবুল ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

জলে পচা গন্ধ উঠছে। মিন্নু কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারছে না। যেন জোর করে শুয়ে থাকা। কেবল ওর ইচ্ছা হচ্ছে ছইয়ের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। আর কত সময়, কতক্ষণ লাগবে শেষ চৌকিটা পার হতে? যত এগিয়ে যাচ্ছে তত ওর চোখে-মুখে একটা কষ্টের ছাপ ফুটে উঠেছে। সে একবার বসছে, একবার বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে, একবার দিলীপের মাথার কাছে বসে টর্চ মেরে ব্যাণ্ডেজটা দেখছে। কেমন নিস্তেজ চোখ-মুখ। অধিক রক্তপাতে মুখটা বুঝি সাদা হয়ে গেছে। এবং মুখের উপর সামান্য টর্চের আলো পড়তেই বুঝল দিলীপ ওর ভয়ঙ্কর কষ্ট কাউকে বুঝতে দিতে চাইছে না। সে দাঁত খিচে পড়ে আছে।

এখন আর কিছু ওরা করতেও পারছে না। এ-ভাবে ওরা যেন এই সব শক্ত কঠিন মুখ দেখে আরও বেশি সাহসী হয়ে যাচ্ছে। নতুবা মিন্নু জানে, অন্য সময় হলে সে একবিন্দু সময় এ-ভাবে থাকতে পারত না। সে ছটফট করত ভীষণ। এখনও যে করছে না তেমন নয়, তবু সে কোথায় যেন একটা সাহস পাচ্ছে, যা তাকে ভেঙে পড়তে দিচ্ছে না।

সুতরাং দুপাশে তার আবুল, এবং ছোট্ট মেয়েটা, বেশ নিরিবিলি ঘুম যাচ্ছে। এবং এই যাত্রায় কেন জানি চুপচাপ বসে থেকে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে খুব ভাল লাগল মিন্নুর। সে ছইয়ের নিচে বসেই আকাশ দেখতে পাচ্ছে, নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছে, দুপার অস্পষ্ট, শেয়ালের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে, অথবা কোন দূরে গ্রামে কুকুরের চিৎকার। এবং মনে হয় কোন মসজিদে আজান দেবার সময় হয়ে গেল। মধ্যরাত্রে কেউ যদি আজান দেয়, চারপাশের এই চাষবাসের জমিতে, তবে ফসল উর্বরা না হয়ে যায় না। কেউ যেন দূর থেকে আজান দেবে, বলবে, "এমন এক চাষবাসের জমিতে এবার আমরা মুক্ত। সে আবুলকে নিয়ে এবং তার নিজের মানুষকে নিয়ে কিভাবে যে তারা এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্রমে জড়িয়ে পড়ল—কোথায় যে মনের

ভিতর এক বিজয়-উৎসব রয়ে গেছে যা তাদের নিরন্তর মাঠ-ঘাট পার হয়ে যেতে বলে! সে এবার বাইরে এসে দাঁড়ালে সাবির বলল, ঘুম হয়ে গেল ?

মিন্নু ঘুমের কথা না বলে বলল, মাতিনকে দেখা যাচ্ছে ?

সাবিরের হাই উঠছিল। সে হাই তুলতে তুলতে বলল, না।

—ওটা কি গ্রাম ?

—জানি না ভাবি।

—গ্রামের নাম জানেন না ?

—না ভাবী। কবিরুল বলতে পারবে! বলে সে ওপাশের উদ্দেশ্য করে বলল, ওটা কি গ্রাম রে ?

—মাঝের পাড়া।

—তারপর তো কোন গ্রাম দেখা যাচ্ছে না।

—সব মাঠ ত্বপাশে।

—এখানে বড় একটা মেলা হয় চৈত্রমাসে।

—কবে হয় ?

—কবে হয়! বলে কবিরুল হিসেব করে বলল, আর চার-পাঁচ দিন পরই হবে।

—এখন তো কোন কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

—এখন আলিপুরাতে মেলা বসার কথা। মেলার জন্য প্রচুর নৌকা এসেও ছিল। কিন্তু মেলা এবার হবে না, সব ছত্রভঙ্গ। নৌকাগুলি আটকে দিয়েছে।

—আমাদের বড় জায়গা কোনটা ? মিন্নুর মাথা থেকে ঘোমটা সরে গিয়েছিল, সেটা একটু তুলে কবিরুলকে প্রশ্ন করল।

—আলিপুরার বাজার।

—বাজারে তবে সেই সব নৌকা থাকছে ?

—থাকবে।

—আচ্ছা আমাদের পিছনে ত্বটো নৌকা আসছে দেখতে পাচ্ছ ?

কবিরুল বলল, মনে হচ্ছে এগুলো পাশের গাঁয়ের নৌকা। ওরা শহর থেকে আসে নি।

—একটা ব্যাপার তোমরা লক্ষ্য করেছ কিনা জানিনা, কিন্তু আমার কাছে বড় বিস্ময়ের মনে হচ্ছে।

এমন কথায় সাবির এবং মাতিন উভয়ে কেমন সহসা সাবধান হয়ে গেল। ওরা বলল, কিছু তুমি বুঝতে পারছ?

—না, বুঝতে পারছি না।

কবিরুল লগিটা এবার ছইয়ের মাথায় গুঁজে দিল। লাফ দিয়ে সে ছইয়ের মাথায় উঠে দুটো বৈঠা দুদিকে ঠেলে ফেলে দিল, তারপর ছপ্ ছপ্ দাঁড় বাইতে থাকলে মিনু বলল, আলিপুরার বাজারের চৌকিতে সব নৌকা দেখে ছাড়ছে। একমাত্র ফ্যামিলি থাকলে খুব একটা বেশি দেখছে না। সব বুঝলাম। কিন্তু এ-পথে তো নৌকাই আসছে না। এটা শহর থেকে প্রায় আট মাইল হবে, এখানে ওরা নৌকা চেক করবে বলে আমার মনে হয় না।

সাবির বলল, তুমি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছ না। পাঁচ-ছ' দিন থেকে যত নৌকা শহর থেকে ছেড়েছে সব পঞ্চমীঘাটের কাছে আটকে দিয়েছে। নৌকা ছাড়ছে না। ভিতরে যা খবর, তাতে আমরা জানি হাঁড়ি-পাতিলের নৌকা, খড়ের নৌকা অথবা তরমুজের নৌকায় ওরা বেশি সার্চ করবে।

কবিরুল একটা বিড়ি ধরাল, এবং চোখে-মুখে তার বিড়িটার আস্বাদ ধরা পড়ছে। দুটো টান মেরে সে ও-পাশে বিড়িটা ছুঁড়ে দেবার সময় বলল, আমাদের সবই শোনা ভাবী। এখন যা মনে হচ্ছে আমার, সব নৌকাই একজায়গায় আটকে দিচ্ছে। ওরা যখন খুশি হবে দেখে-শুনে ছাড়বে।

সামনে এখন তিন-চারটে নৌকা। বোধহয় নৌকায় কয়লা-ঝিঙে। শহরে যাবার কথা তাদের। শহরে যাচ্ছে না। ওগুলো যাবে খাড়ি নদী ধরে শীতলক্ষ্যায়। কোথাও পথ নেই। এবং বোধহয় ওদের

নষ্ট হয়ে যাবে। ওদের একজন মাঝি বলল, তুটো একটা করে নৌকা ছাড়ছে। এবং রাতে রাতে কাজ শেষ করে ফেলবে।

আরও খবর পেল, যাদের সন্দেহ হচ্ছে ওদের, ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এবং কিছুক্ষণ পর গুলির আওয়াজ। যেখানে ছাউনি পড়েছে সেদিকটায় আর কোন লোকালয় নেই। সব খালি হয়ে গেছে।

ওরা যাবার সময় আরও তুটো একটা নৌকা দেখতে পেল। এখানে নদীটা বেশ প্রশস্ত। এবং নৌকা চালাতে কষ্ট কম। তু-পাড় খাড়া। বোধহয় বর্ষায় পাড় ভাঙার জন্য তু-পাড় এত বেশি খাড়া হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও খণ্ড খণ্ড জমি ফাটল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন সময় যেন নদীর জলে ভেঙে পড়বে। অথচ ওরা জানে পাড় ভেঙে পড়বে না। বর্ষা না এলে এবং খরস্রোতে জল না নেমে এলে এই সব কানি তুকানি জমি নিয়ে ফাটল ভেঙে পড়বে না। ওরা সেজন্য যতটা পারছে কিনারে কিনারে থাকছে। সাইকেল চালাতে অসুবিধা হবে ভেবে মাঝের পাড়া পার হলে চর, নাম মাঝের চর, সেখানে মাভিন সাইকেলটা আবার তুলে দিয়ে গেছে।

মিনু ছইয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুর ফুর করে বাতাস বইছে। ওর চুল উড়ছিল। ভিতরে কোন আলো জ্বেলে রাখা হয় নি। সে বুঝতে পারছে কবিরুল এবং সাবির ঘেমে নেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ওরা জল তুলে মুখ ধুচ্ছে। গায়ে পায়ে জল দিচ্ছে। ওদের মুখ অস্পষ্ট। তবু চোখতুটো জ্বলছে বোঝা যাচ্ছে। মাথার উপর নদীতে আমের ডাল। কামিনী ফুলের সুবাস আসছে। নৌকাগুলো অন্ধকারে কাছাকাছি এলেই হেঁকে ওঠা—যে যার বায়ে। এবং লগি মেরে যারা যাচ্ছিল, বলতে বলতে যাচ্ছে, কি যে হইয়া গ্যাল ছাশে মিঞা! আমাগ আর কি থাকল? আমার মাটি নেয় কান্না কাইড়া! অগ নাম কি জানেন আপনেরা?

এসব শুনলে মিনুর ভিতরটা কেমন করে ওঠে। ওদের ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারত। কিন্তু যে জিজ্ঞাসা করবে, তার তো চেতনা

নেই। কাছে যেতে ভয় লাগছে। যদি সে শক্ত হয়ে যায়। মিন্নু যে কি করবে! এবং ভয়েই যেন সে আবার হাত দিয়ে দেখতে সাহস পায় নি। মাঝে মাঝে ডাকলে তন্দ্রার মত দিলীপ উত্তর দিয়েছে। সে যদি ঘুমায়, যদি তার ঘুম আসে, এই ভেবে মিন্নু তারপর ডাকেনি পর্যন্ত। অনেকক্ষণ হল ওর কোন সাড়া-শব্দ নেই। সুতরাং এখন যা কিছু কাজ আমিনুল করবে। অথচ আশ্চর্য, আমিনুল একপাশে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে। এমন কি সে যে আছে নৌকায়, বোঝাই যাচ্ছে না। এত যে সে কথা বলল, নৌকার কথা, গ্রামের কথা, কিছুই যেন সে শুনতে পায় নি।

মিন্নু এবার ছইয়ের ভিতর দিয়ে ওপাশে উঠে গেল। উঠে গেলেই দেখতে পেল, সে চুপচাপ বসে নেই। সে তালপাতার পাখা দিয়ে দিলীপের মাথায় বাতাস করছে। সে ওর পাশে বসে বলল, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও আমিনুল। আমি ওকে বাতাস করছি।

আমিনুল বলল, ভাবী, এখন কথা বলবেন না। আমরা কিন্তু আর বেশি দূরে নেই।

তবে বসে বসে সে সব শুনছে। মিন্নু বলল, কতদূর আর?

সে হাত তুলে দেখাল, উপরের দিকে ছাখেন।

মিন্নু উপরের দিকে তাকাল।

—একটা ছায়া মত গাছ, বড় গাছ দেখা যাইতেছে, না?

মিন্নু অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজে পেল না। বস্তুত, আকাশের নিচে শুধু বড় একটা নক্ষত্র জ্বলছে। এবং আকাশ কেমন কৃষ্ণকায় অদ্ভুত এক অস্পষ্ট ফলার মত মাথার উপর জেগে আছে। সে বলল, না, কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—সবুর করেন, বাউড় ঘুরলে ছাখতে পাইবেন। বলে সে ঘাড় গুঁজে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে, যেন গালে দিলীপের শ্বাস লাগছে টের পাবার চেষ্টা করল। মিন্নু দিলীপের হাত নিয়ে পাল্‌স্ দেখল। ভাল চলছে না। এবং মনে হয় সে ভিতরের যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা গেছে।

এই মূর্চ্ছা যাওয়াটুকু ওর ভাল লাগছে। সে ভিতরের কষ্টটা তবে বুঝতে পারবে না। এবং এই কষ্ট বুঝতে না পারলেই সে ঘুমোচ্ছে এমন মনে হয়। মিনু কেমন নিজের এই ভাল লাগাটুকুর ব্যাপারে অবাক হয়ে গেল। বস্তুত, সে ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যাচ্ছে—এখন মায়া-মমতা বলে তার যেন কিছু নেই। সে যে এমন কি ভাবে হয়ে গেল! কেবল তুজনের জন্য এবং এই যে একটা ছোট্ট মেয়ে শুয়ে আছে তার জন্য অদ্ভুত এক মায়ার আকর্ষণ, যা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে দিতে পারছে না।

ওরা এ-ভাবে যাচ্ছিল। এবং যেতে যেতে মনে হল আরও সব নৌকা চলে আসছে। এবং নৌকাগুলো যে ভয় পেয়ে যে যার মত ছুটে চলে যাচ্ছে, তাদের চলে যাওয়া দেখে তা ধরা যাচ্ছে। আরও কাছে গেলে ওরা টের পেল অনেক নৌকায় লোকজন নেই। ওরা নৌকা ছেড়ে পালিয়েছে। এবং মনে হয় তুপাশের জমিতে কিছু লাস পড়ে আছে। নদীর জলে লাস। ওরা বুঝতে পারল, যারাই নৌকা ছেড়ে পালাতে গেছে তাদের দিকে মেশিনগান দেগেছে। অথচ আশ্চর্য, এখন মনেই হয় না ও-পারের ছাউনিতে কোন লোক আছে। কেমন নিঝুম হয়ে আছে সব। কেবল মাঝে মাঝে নৌকার শব্দ, লগির শব্দ। কোন মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পেলেও তুজন একজন লোক, যারা জলে জলে ডুবে অন্ধকার রাতে মাঠের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ওরা অন্ধকারে নৌকা ছেড়ে পালাচ্ছে। বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য শিথিল হয়েছে পাহারা। এবং এ-সময়েই ওরা ও-পাড়ে, ঠিক ও-পাড়ে নয়, আরও দূরে দেখতে পেল কামানের গোলা উপরে উঠে যাচ্ছে। আশ্চর্য, নদীর দিকে ওরা কামান দাগছে না। নদীর ও-পারে যে মাঠ আছে, মাঠের ও-পারে ওরা কামানে দাগছে। পঞ্চমীঘাটের কাছাকাছি মনে হয় ব্যাপারটা ঘটছে। গোলার শব্দে সবাই জেগে গেল। মাতিন বলল, মনে হয় বেটাদের সাবাড় করতে আসছে আমাদের কেউ। ওরা ও-পাশ থেকে আক্রমণ করছে।

আবুল ঘুম থেকে জেগেই বলল, মা। সে হাতড়ে মাকে খুঁজল। যেন সে তার তক্তপোষে শুয়ে আছে। পাশে, ঘুম থেকে উঠে মাকে দেখার বাসনা। সে যেন তার সেই ঘরে এবং জানালার পাশে খাটের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠে সে বুঝতে পারে নি সে নৌকায় আছে। নৌকা দুলছে বলে সে ঠিকমত বসে থাকতে পারছিল না। সে যেমন ঘুম থেকে উঠেই বারান্দায় গিয়ে তার প্রিয় টিয়াপাখিটার পাশে চোখ-মুখ মুছতে মুছতে গিয়ে দাঁড়ায়, তেমন এখন দাঁড়াবার ইচ্ছা। কিন্তু সে এভাবে দুলছে কেন? এবং অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে। অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুপাশের ফাঁকা জায়গা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সে পাটাতনে বসে আছে। এবং চারপাশে ওরা কারা বসে আছে? কে ওপাশে শুয়ে আছে? শক্ত হয়ে শুয়ে আছে। কেউ কোথাও বসে বসে কাঁদছে মনে হয়। কে কাঁদছে? মনে হল সবাই কাঁদছে। সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আবার ডাকল, মা! মা। আরো জোরে ডাকল। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। চোখের সামনে অদ্ভুত একটা বিস্ময় বার বার হাত দুলিয়ে কি যেন ওকে বলতে চাইছে। সে ডাকল, মা, তুমি কাঁদছ কেন? আমি এখানে।

তখন মিনু বলল, এদিকে এস আবুল। তোমার দিলীপচাচা মারা গেছেন। ওর পাশে এসে বসো।

মিনু অন্ধকারেই দিলীপের হাত তুলে দিল আবুলের হাতে। নৌকাটা এখন চলছে না। ঢেউ খেলে যাচ্ছে জলে। নৌকাটা একবার পূবে আবার পশ্চিমে কাত হচ্ছে। ওকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে সবাই। মাত্তিন নৌকায় উঠে এসেছে। ওরা গেরাফি ফেলে রেখেছে। টান টান হয়ে আছে দড়িটা জলে। ওকে ওরা ঘিরে বসে থাকল আর ওপারে দেখল, মাঠের উপর দিয়ে গ্রামের ছায়া কাটিয়ে বড় বড় কামানের গোলা যেন সব সবুজ ঘাস, মাঠ, পাখি ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে।

গোলাগুলো আকাশে উঠলেই সব জায়গাটা অদ্ভুত ভয়াবহ আলোতে ভরে যাচ্ছে। সবাই মাথা গোঁজার জন্য জায়গা খুঁজছে। এই ভাল যে গোলা এদিকে আসছে না। ঠিক উল্টোদিকে যাচ্ছে। ওরা এপারে বসে সেই আলোতে দিলীপকে যা কিছু ছিল সঙ্গে তাই দিয়ে সাজিয়ে দিল। মাতিন নদীর পাড় থেকে খুঁজে খুঁজে কিছু পাটকাঠি সংগ্রহ করে এনেছে। ওদের নিয়ম-কানুন ঠিক মত মিনু জানে না। তবু যতটা পারল বিধিমত একটু আগুন দিল মুখে। আবুল মুখে আগুন দেবার সময় চাচার সেই হাসিখুশী মুখটা দেখতে না পেয়ে কেমন ডুকরে কেঁদে উঠল। মিনু বলল, এস আমরা সবাই ধরে ওকে পানিতে ফেলে দিই। সে তো আর আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। বলে কান্নায় গলা ভেঙে এলে, মুখে আঁচল গুঁজে, ধরাধরি করে ওকে জলে ফেলে দিলে এক আশ্চর্য জগৎসংসার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। হায় দেশ, বাংলাদেশ, তোমার নদীর জলে যে মানুষ হারিয়ে যায় তারে তুমি ছাখো। আমরা আছি সবাই পাশাপাশি, কাছাকাছি। কেউ আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না।

॥ দশ ॥

ওর নাম হামিদ, কেউ বলে নবীন। আবার শোনা যায় সে ইয়াকুব মিঞার ডেরায় ছিল বলে সঠিক কি নাম কেউ জানে না। পাগল মানুষ। এ অঞ্চলে সে আছে অনেকদিন থেকে। সে ভাল পীর মুর্শিদের গান গায়। ওর গলার স্বর খুব তাজা। এ অঞ্চলের সবাই দেখেছে সে মসজিদে যেমন মোমবাতি দেয়, সে আবার কখনও কখনও কালীবাড়িতে রাঙাজবা রেখে আসে। তা পাগলের কাণ্ড না হলে এমন হবে কেন! সে কিছুদিন ধরে নান্নু মিঞার বাড়িতে আছে। সে সতেরো নম্বর কুটির থেকে সাতাশ নম্বর কুটির পর্যন্ত যত পানি লাগে দিয়ে আসে। ওকে নিয়ে একবার মেহের বৈদ্যের বাজারে হরিপদ সাহার দোকানে গিয়েছিল, কিছু মশলা আসবে। গোটা পথটা সে মশলার বাক্স কাঁধে করে এনেছে। মেহেরের কাঁধে রাইফেল। সে পাহারায় ছিল সব সময়। যখন ওরা নান্নু মিঞার বাড়ি পৌঁছাল তখন হামিদের কাঁধে ভারি বস্তুটা এত বেশি দেবে গেছিল যে প্রায় কাটা ঘায়ের মত। খুব বলশালী মানুষ হামিদ। সে বসেছে মেহেরের ক্যারিয়ারে। মেহেরের বেশ কষ্ট হচ্ছিল টানতে।

এতক্ষণ ওরা গান গাইছিল। সমস্বরে গান। ময়নার গানের গলা খুব ভাল। সাইকেলে ময়না আছে ঠিক মাঝখানে। ওর রাইফেলটা আকারে ছোট। অন্য রাইফেলগুলো সব পুরনো এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হয়তো কেউ কেউ ব্যবহার করেছে। সব পি-ফোরটিন রাইফেল। ভীষণ ভারি। কেবল ময়নার রাইফেলটা হাল্কা এবং আধুনিক। এটা মেহেরই ঠিক করেছে। কারণ যে ফ্রণ্টে ওরা লড়তে যাচ্ছে, ময়নার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে বলে যা কিছু ভাল, যেমন পোষাক, কারণ যে পোশাক ময়না পরে আছে কে বলবে ময়না যুবতী মেয়ে,

ময়না সুন্দরী এবং রূপসী। ওকে দেখলে এখন মনে হবে সুন্দর এক তরুণ যুদ্ধে যাচ্ছে। সে তার লম্বা চুল বেণী করে খুব কায়দার সঙ্গে মাথার উপর হেলমেটের ভিতর ঢেকে নিয়েছে।

অরুণ সবার পিছনে। ফিরোজ ময়নার আগে। ময়নার পিছনে আবেদালি। সবার আগে মেহের। মেহেরের ক্যারিয়ারে হামিদ। হামিদ চুপচাপ বসে অন্ধকার রাতে বাতাসে হাওয়ায় চষা মাটির গন্ধ পাচ্ছে। অথবা মনে হচ্ছিল ওরা জাম জামরুলের গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছে। পাকা জাম, গাছের নিচে। কিছু জাম পচে গেছে, তার পচা গন্ধ। এ গ্রামের নাম পানাম। দুধারে সব পুরনো ভাঙা বাড়ি। পোদ্দারদের বড় প্রতিপত্তি ছিল একসময় এখানে। ওরা কেউ কেউ আছে। অধিক সংখ্যায় চলে গেছে ওপারে। রাতে ওরা কোন আলো জ্বলতে দেখল না। নিশুতি রাত এবং মাঝে মাঝে কুকুরের আর্তনাদ। পাঁচটা সাইকেল যাচ্ছে। ওরা এই পুরনো গঞ্জের মত জায়গায় ঢুকেই আর গান গাইছে না। ওরা নিঃশব্দে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি ওরা চাইছে না, ওরা যে যাচ্ছে, কেউ টের পাক। সামনের গ্রামগুলিতে মুসলিম লীগের কিছু মানুষ আছে। ওরা গতকাল দাঙ্গা করে গেছে। খান সৈন্য মিলে এ অঞ্চলে নরহত্যা ধর্ষণ এসব ঘটলে ওরা টের পায় এখানে ঠিক গান গাওয়া উচিত না। ওরা এ পথটুকু নিঃশব্দে পার হয়ে যাবে।

ওরা নিঃশব্দে পার হবার সময়ই দেখল, পোদ্দারদের বড় বাড়িতে ধোঁয়া উঠছে। ওদের রাধা-গোবিন্দের মন্দির থেকে ধোঁয়া উঠছে। ওরা যাচ্ছে এখন গাবতলির খাল ধরে। পোদ্দারের বড় বাড়ির সদর দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে একটা পাঁচিল-ঘেরা ফলের বাগান। মনে হল অন্ধকারে কেউ কেউ বাগানে লুকিয়ে আছে, অথবা আত্মগোপন করে আছে। চারপাশে ধোঁয়া, চারপাশে আগুন। ওদের যাত্রা-গানের জন্য বড় আটচালার ঘরে আগুন। মেহের কতদিন রাবণ-বধের পালা শুনতে এসেছে। কত লোক, ঝুলনের সময় কত রকমের

মিছিল। এবং নানা রকমের পুতুল, অথবা খেলনার রেলগাড়ি, ছোট ছোট মাটির টিবি দিয়ে পাহাড়। আর কত লোক আসত তখন! পানামের ঝুলন ছিল এ-অঞ্চলে বিখ্যাত। বর্ষাকাল বলে, মেহের অরুণ আর কিরণমালা আসত নৌকায়। কিরণমালা ছিল মেহেরের বোন। ঝুলন যাত্রাগান শোনার জন্য বাড়িতে প্রায় না বলে না কয়ে চলে আসত। কিরণমালা কত ছোট ছিল তখন। কিরণমালার ভাল নাম ছিল হাসিনা বেগম, কিরণমালা নামটা দিয়েছিল গোবিন্দ সাহার বৌ। বলেছিল, ওর নাক দেখে, চোখ দেখে, আর নাকের নোলক দেখে, কেবল আমার গল্পের কিরণমালার কথা মনে হয়। সেই থেকে কি করে যে ওর নাম কিরণমালা হয়ে গেল। এবং সবাই ডাকত কিরণমালা বলে। আদরের বোনটা, বড় ছোট সে, পায়ে মল বাজত, এবং ছাগলের দড়ি ধরে মাঠে গিয়ে দাঁড়ালে মেয়েটাকে একটা ছোট্ট শালিখপাখি মনে হত। অরুণের সঙ্গে সে আর কিরণমালা একবার পালিয়ে এসেছিল, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ঘাটের নৌকা নিয়ে যাত্রা দেখতে চলে এসেছিল। এমন নেশা যাত্রাগান শোনার। যাত্রা-গান ভেঙে গেলে ভোর-রাতের দিকে খালের ধারে এসে দাঁড়ালে অবাক। কেউ প্রথমে কোন কথা বলতে পারেনি।

ওরা এসে গাবতলির খালের পাড়ে দাঁড়াতেই দেখেছিল অজস্র নৌকার ভেতর ওদের নৌকাটা নেই। নৌকাটা কোষা নৌকা। গুঁড়ার সঙ্গে সে শেকল দিয়ে একটা রসুনগোটা গাছের কাণ্ডে তালা মেরে রেখেছিল। আশ্চর্য, শেকলটা পড়েছিল, তালা খোলা ছিল না, গুঁড়া করাত দিয়ে কেটে নৌকা চুরি করে কারা নিয়ে গেছে। ওঁরা সাঁতার কেটে খুব সকালে নিজেদের গ্রামে উঠে গেছিল। কেউ জানতেই পারেনি মেহেরদের বাড়িতে, মেহের নৌকা নিয়ে গিয়েছিল এবং নৌকাটা আর ফিরে আসেনি। মেহেরের বা'জান সকালে উঠলে দেখল ঘাটে নৌকা নেই। কারা চুরি করে নিয়ে গেছে নৌকাটা।

মেহের এভাবে নৌকা চুরির দায় থেকে রেহাই পেয়েছিল। বেশ মজা করে সে বলল, হ্যাঁ রে অরুণ, তোর মনে আছে যাত্রাগান শুনতে এসে আমাদের নৌকা চুরি গেল ?

অরুণ সবার পিছনে বলে কথাটা শুনতে পায়নি। সে বলল, কি বলছিস বুঝতে পারছি না।

মেহের বেশি কথা বলতে গেলে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। কারণ পিছনের ক্যারিয়ারে হামিদ, বলশালী মানুষ হামিদকে সে বেশিদূর বুঝি টানতে পারবে না। মেহের মুখ খুলে শ্বাস নিল। তারপর চিৎকার করে বলল, আরে ঐ যে, তুই আমি কিরণ একসঙ্গে এসেছিলাম রাবণ-বধের পালা দেখতে। মনে নেই ? ভোর-রাতে গিয়ে দেখি নৌকা চুরি।

—খুব মনে আছে।

—সেশ দিন ছিল রে আমাদের ! দেশে আর সেই সব যাত্রাগান হয় না।

—কোত্থেকে হবে। বলে অরুণ একটু তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে মেহেরের পাশে পাশে চলতে থাকল। পাকা রাস্তা বলে বেশি কষ্ট হচ্ছে না। আর কিছু দূর গিয়েই তারা মাঠে পড়বে। এবং আলে আলে ওদের সাইকেল চলবে। তখন হামিদকে বদলা-বদলি করে নিতে হবে। অরুণ বলল, কি রে ময়না, তুই যাত্রাগান শুনিসনি ?

ময়না বলল, গুনাই বিবির গান আমাদের দিকে খু* হত। যাত্রা-গান শুনিনি অরুণদা।

ফিরোজ বলল, তোর ভাগ্যটা খারাপ।

—খুব খারাপ।

ফিরোজ যেন কথাটা বলে কেমন অপরাধ করে ফেলল ভাব। তারপর চুপচাপ থাকলে ময়না ধরতে পারে—এমন কথা বলে ফিরোজ মনে কষ্ট পাচ্ছে। ওর চুপচাপ থাকা দেখেই সে ধরতে পারল ফিরোজ মনে মনে এ-কথাটা আবেগের বশে বলে ফেলেছে। ময়না সেজন্য মনে কিছু করে না। স্বামী বিহনে জীবন-যাপন কি যে কষ্টের ! সে

তবু জানে, তার সব কিছু এই যে জামা খুলে ফেললে পিঠ, এবং পিঠে যারা লিখে রেখে গেছে, বেয়নেটে লিখে রেখে গেছে 'পাকিস্তান', এই সব ওকে যেন কুরে কুরে খায়। নৃশংস ঘটনা। স্বামীর নৃশংস মৃত্যুর ছবি চোখে ভাসলে ময়নার চোখ যেন প্রতিশোধে পাগলের মত হয়ে যায়। একটা গাছের নিচে নিয়ে বেঁধে রাখা সারাদিন। গাছটার ডালে দুটো হাত তুলে তার বেঁধে রাখা। তারপর এখানে সেখানে খোঁচা দিয়ে রক্তপাত, আর সেই কঠিন মুখে, প্রত্যয়ে কঠিন মুখ কি যে দৃঢ় ছিল, তবু কবুল করাতে পারেনি, এ-দেশ বাংলাদেশ নয়, এ-দেশের নাম অন্য নাম, সে কেবল বলেছিল, দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার। যতবার খোঁচা খেয়েছে ততবার রক্ত ওগলাতে ওগলাতে বলেছে, দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার, মা মাগো, এবং এই সব কথার ভিতরই বেয়নেট দিয়ে পেট চিরে দিয়েছিল খান সৈন্যরা। তবু তার মুখ থেকে প্রায় এক অমোঘ বাণী, ঈশ্বর-প্রেরিত দেবদূতের মত শপথ, দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার, সামনে তার ময়না ভালবাসার স্ত্রী, ধর্ষণে বার বার চোখের তারা সাদা হয়ে যাচ্ছে ময়নার, ময়নাও বলছিল, দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার। কি করে যে এমন সাহস, যেন সেই কোর্টের গম্বুজে সোনালী সবুজ নিশান উড়ছে। সেখানে লাল সূর্যের ভিতর বাংলাদেশ। হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে শহীদ মিনারে। সে-ও যায়। যায় কিনা জানে না, জানালায় এসব শুনে শুনে বর্ণমালা পড়তে পড়তে চারপাশে যেন সেই পাঠ, শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে। অথবা সেই যে কবিতা, পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল, যেন সব চারপাশে মা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা হয়ে আছে। ওরা ময়নাকে মৃত ভেবে ফেলে চলে গেছিল। এবং পিঠের উপর নির্মম, কাটা কাটা দাগ। দাগটা শুকিয়ে গেলে সবাই দেখেছিল, অদ্ভুত কায়দায় পিঠের মাংসে লেখা, ওরা লিখে রেখে গেছে, পাকিস্তান, মানে পবিত্র স্থান।

এখনও যেন সেই সব নির্মম কাটা কাটা দাগ পিঠের উপর কঠিন

পীড়া সৃষ্টি করে রেখেছে। সে রাইফেলটা কাঁধ পাল্টাল। মাঝে মাঝে মনে হয় পিঠের চামড়ায় কে শূল বিঁধিয়ে দিচ্ছে। সে যদি সামনে, অর্থাৎ বুকে কিংবা জংঘায় এই নির্মম দাগ দেখতে পেত, তবে নিজ হাতে কেটে কেটে রক্তের ভিন্ন দাগ সৃষ্টি করত। অবিরল ধারায় রক্তপাত হলে নির্মল জলের মত ধারা নেমে আসত। এবং নতুন ঘায়ের সৃষ্টি হলে পুত পবিত্র কথাটা থাকত না।

কতদিন সে মেহেরকে, ফিরোজকে বলেছে তোরা পারিস না আমার পিঠের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিতে? চৌকোণ করে কেটে ফেল, তারপর ছাল ছাড়ানোর মত তুলে ফেল। তখন দেখবি সাদা মাংসের ভিতর দাগগুলো আর তেমনভাবে নেই। আমি নুন ফেলে ঘা-টা গভীর করে দেব। ঘা শুকিয়ে গেলে সব মুছে যাবে। কখনও কখনও সে পাগলের মত নিজের পিঠে ছুরি চালিয়ে চিরুনীর মত আঁচড়ে দিয়েছে, সবাই ভেবেছিল এই দেখে, ময়না পাগল হয়ে যাচ্ছে। ওকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হত তখন। সে শুয়ে শুয়ে চিৎকার করত--আমি বাঁচব কি করে, দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার!

সুতরাং এ-হেন মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা দন্দি লাধুর চরের মাঝ-খানে যে শ্মশানটা আছে সেখানে। জায়গাটা নির্জন, নির্জন বলেই ঠিক করা হয়েছে জায়গাটা। কাঠের বাক্সটা নিয়ে আসবে আমিনুল। সঙ্গে মিনুবৌদি, আবুল থাকবে। দিলীপের ওপর কাজগুর ভার। সুতরাং সে অনেকদিন পর দিলীপকে দেখতে পাবে। ফিরোজ, তোর ভাগ্য খারাপ এমন বললে যেন মনে হয় ময়নার স্বামী বড় মিঞা মরে গিয়ে ওকে দুঃখিনী করে রেখে গেছে। অথবা ধর্ষণের কথা মনে হতে পারে এবং পিঠের উপর যে কাটা দাগ, সে সব কথা মনে হলেও ময়না কষ্ট পেতে পারে। সেজন্য ফিরোজ কথা বলছে না। ময়নাও এটা ধরতে পেরে বলল, ফিরোজ তোর বড় ভাইয়ের খবর কিরে?

ফিরোজ বলল, এখন পর্যন্ত ওর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

ফিরোজ সবার ছোট। ওর মুখে এখনও ভাল করে গোফঁ ওঠে নি।

সবল, চোখ উজ্জ্বল। কথা বলে কম। যখন বলে একসঙ্গে অনেক কথা। আবার চুপচাপ কিছু সময় অথবা সারাদিন কিছু বলে না, কেবল কি যেন ভাবে। মাথার চুল ঘন। চুল ব্যাকব্রাস করা। মিহি চুল তবু যেন সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। এখন সাইকেলে ওরা যাচ্ছে বলে বাতাসের বেগে চুল উড়ছে। দেখলে মনে হবে গম ক্ষেতের শিস বাতাসে দুলছে। খাওয়া-দাওয়ার কোন নিয়ম থাকছে না। তবু চোখে-মুখে আশ্চর্য তাজা ভাব ফিরোজের। ফিরোজ বলল ফের, মনে হয় কেউ ওরা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে, এতদিন পরেও দেশে ফিরে আসত। আকবর গেছিল। কেউ খবর দিতে পারে নি। পরিচিত কেউ নেই। পাড়া ফাঁকা! কোথাও পচা ভ্যাপসা গন্ধ। কুকুর ডাকছে কেবল। ইডেন হোস্টেলের সামনে নদীর পাড় ধরে সব মরা মানুষের মিছিল। যেদিকে চোখ যাবে—দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার।

এই এক বেশ কথা আছে ওদের ভিতর। ওরা যেতে যেতে গায়, দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার। আমরা যে চারপাশে যা কিছু দেখি, গাছ ফুল পাখি, মাগো যা কিছু তোর আছে, সব মিলে তুই বাংলাদেশ, সব মিলে মা তুই বাংলা ভাষা।

এই অন্ধকার রাত, গ্রাম মাঠ, শুকনো নদী, কাঠের পুল, এবং মরা দিঘীর পাড়ে জাম জামরুলের গাছ ওদের কেবল একটা কথাই বলছে, দ্যাখো রে বাহার, দ্যাখো রে মানুষের বাহার, যায় না কিছুই বিফলে, তোমরা যাচ্ছ, তোমরা মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছ, তোমরা টের পাচ্ছ শৈশবের সেই দুলে দুলে পড়া, নকসিকাঁথার মাঠে সুন্দরী রূপসী যায়, মাথায় ঘোমটা, পায়ে মল, হাতে বাজু আর কঙ্কনের শব্দ। নাকে নোলক দোলে, মাগো সেই বুঝি আমার বর্ণমালা, কাজল দিঘীর পারে পারে হাঁটে। এ-ভাবে যেতে যেতে ওরা নানা স্মৃতিভারে যখন ডুবে যাচ্ছিল, তখন হাঁকল, মেহের, গান গাও, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার।

যেন সেই গান, তুমি নীরব কেন কবি ফুলেই জলসায়। আজ

আমরা কাণ্ডারি হুঁশিয়ার শুধু গাইব না, বলে ময়না একটু বেঁকে সাইকেলটা দ্রুত চালিয়ে অরুণের পাশ কাটিয়ে একেবারে মেহেরের পাশে পাশে চলতে থাকল। মেহেরের ক্যারিয়ারে হামিদ। কেমন লজ্জায় মুখ নিচু করে রেখেছে হামিদ। সে ফ্রন্টে গোলক ধাঁধা বানাবে। সে মরদ সাজবে, আর ময়না দরকার পড়লে বিবি, মিঞা-বিবি যায়, গান গায়, যেন আউল-বাউলের মত মিঞা-বিবির পথ সঠিক জানা নেই। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাওয়া। ময়না হামিদকে মুখ নুয়ে থাকতে দেখে বলল কি গো মিঞা, আমার মরদ হতে পারবা তো? ওরা ছদ্মবেশে দেশের জন্য কাজ করে বেড়াবে।

বাধ্য ছেলের মত মাথা নিচু করে দিল হামিদ। হামিদের অদ্ভুত মুখ। বোকা ধরনের। চোখ দুটো আশ্চর্য রকমের নিঃস্ব। প্রথমে দেখলে মনে হবে সে স্বাভাবিক মানুষ নয়। দেখলে মনে হবে, জড়বুদ্ধি তার চোখেমুখে খেলা করে বেড়ায়। হাবার মত সে চেয়ে থাকে। এবং যখন যার যেমন খুশি তাকে নিয়ে পেছনে লাগে। এখন এই যে যাওয়া, চারপাশের সব গাছপালার ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যাওয়া, এবং কাল কি ঘটবে কেউ জানে না, ওরা কেউ বেঁচে থাকবে কিনা তাও জানে না, যখন যে-কোন অঞ্চলে ওরা ধরা পড়ে যেতে পারে খান সেনাদের হাতে, সুতরাং যে-ভাবে হোক একটু সময় দসগুলে বেঁচে থাকা এবং আমোদ করা, ময়না হামিদকে দুটো একটা কথা বলে আমোদ করতে চাইলেই মেহের গান ধরে দিল, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার।

আশ্চর্য রকমের ফাঁকা মাঠ। দুপাশের কোথাও আর গ্রাম চোখে পড়ছে না। এ-ভাবে মেঘনার পাড়ে পাড়ে অনেক দূর গেলে বারদী গ্রাম। এবং পুল পার হলে, খালের পাড়ে পাড়ে বানেরসরদি অথবা নওগাঁ গ্রাম, এবং কদমফুলের গাছ। এমন ফাঁকা মাঠ পেলে, কার গান গাইতে ইচ্ছা না করে? অরুণ বলল, আমি তোমাদের এখলাস-উদ্দিনের সেই কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি, বলে গলা ভীষণ তুলে বলল,

কই গেলো তোর কথার ফানুস,
লোভ দেখানো লালটু লাটিম।
তা ছেড়ে সব কই পালালো,
শিং উঁচা তোর হাট্টিমা টিম॥
কই গেলো তোর ঢাল তলোয়ার,
খই ফুটানো বেতার ভাষণ।
কই গেলো তোর শান্ত্রী সেপাই,
কই খোয়ালি সাধের আসন॥
রাত নিশুতে কই পালালি,
কই গেলো তোর দালান কোঠা।
...সব খুইয়ে দাদার এখন
বেবাক পুঁজি গামছা লোটা॥

আবৃত্তি শেষ হলে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। বলল, বেশ একখানা শিশুদের জন্য কবিতা লিখেছিলেন তিনি।

তা ঠিক, এই ভাবেই যেন নিরুপণ হয় প্রত্যেক দেশের জাতির একটা আলদা স্বাদ আছে। মাটি মানুষের আলাদা গন্ধ। এবং এই নিশুতি রাতে ওরা যখন সেই কাঠের বাক্স নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যাবে বলে সাইকেলে গান গাইতে গাইতে অথবা আবৃত্তি করতে করতে যাচ্ছিল, তখন অজস্র তারা আকাশে একটা আশ্চর্য বর্ষার কদমফুলের গাছ হয়ে গেছে। রাইফেলের নলে বেয়নেট এই অন্ধকারেও ঝলসাচ্ছিল। ধারালো নক্ষত্রের মত ওরা প্রত্যেকে পিঠে সেই বেয়নেট উঁচিয়ে যাচ্ছে। মেঘনার জল কি শান্ত। চরের পাশে যে ইতস্তত জলাভূমি, সেখান থেকে কেউ ছপ্ ছপ্ করে উঠে আসছে মনে হল। ওরা সাবধান হয়ে গেল। ওরা সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

ওরা যেহেতু পাড়ে দাঁড়িয়েছিল, কেউ ওদের দেখতে পায়নি। সোজা পথে ওরা যাচ্ছে না। ওরা যাচ্ছে নিরাপদ স্থান কোথায় কোনদিকে কতটা আছে তা দেখে দেখে। ওরা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

আর এখানে এখন নিশুতি রাতে ছায়ার মত কারা উঠে আসছে। গাছের অন্ধকারে ওরা। নদীর জলাভূমির পারে মানুষটা। একটা মানুষ নয়, একে একে প্রায় পাঁচ-সাত করে দশ-পনেরো জনের ছায়া হয়ে যাচ্ছে। এবং টলতে টলতে ওরা উঠে আসছে। খান সেনারা মাঝে মাঝে আটকা পড়লে এমন হয়। পথ ঠিক করতে পারে না। নদীর ওপার থেকে একটা দল যদি ওদের এদিকে তাড়া করে নিয়ে আসে। ওরা আর দেরি করতে পারল না। যে যার মত সাইকেল-গুলো ঝোপে-জঙ্গলে লুকিয়ে পোজিসান নিতে গিয়ে দেখল ওরা আর উঠে আসছে না। ওরা কেমন নদীর চরে ছায়ার মত সারি সারি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

অরুণ বলল, গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

মেহের বলল, তাই মনে হচ্ছে। অন্ধকারে অন্ধকারে যে যতটা পারছে সীমান্তের দিকে পালাচ্ছে।

—এখান থেকে সীমান্ত কত মাইল ওরা এখন বলতে পারবে না।

আবেদালি বলল, তবু ওরা চলে যাবে। আমরা কেউ ওদের রাখতে পারব না।

অরুণ কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওরা কারা সে জানে। ওরা ওপারের হিন্দু, গ্রামগুলো থেকে নেমে এসেছে। একটা ভয় ছড়ানো হচ্ছে, যে-কোন সময় চরের গ্রামগুলোতে আক্রমণ হতে পারে। কিছু অমানুষ ভয় ভীতি এমন প্রবল ভাবে ছড়াচ্ছে যে মানুষ আর চুপচাপ থাকতে পারছে না। অন্ধকারে ওরা যতটা পারছে এগিয়ে থাকছে। এখন এমন কেউ নেই ওদের সাহস দেয়। চারপাশ থেকে কেবল দুঃসংবাদ আসছে। ওদের বড় স্কোয়াড ছিল, গোপালদি নসিন্দিতে, ওরা মার খেয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ। কি যে এ-সময় হবে। তবু শেষ পর্যন্ত যতটা করা যায়। যতটা পারা যায় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

এ-ভাবে ধীরে ধীরে অন্ধকারে ছপ ছপ নদীর জলে অথবা ডাঙায়,

যে-কোন জায়গায় ঠিক নয়, যেখানে গ্রাম মাঠ কম, বন বেশি, তার অন্তরালে দুঃখী মানুষের অনন্ত মিছিল। দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। দুঃখিনী বর্ণমালা মা-র কথা তারা মনে রাখছে না।

ময়না আর পারছে না। যেন সে এই মিছিলে মিলে গিয়ে সবার আস্থা আবার ফিরিয়ে আনতে চায়। আপনারা এটা কি করছেন? ঘরবাড়ি জ্বলে যাচ্ছে, সব পুড়ে যাচ্ছে, আমরা পুডে যাচ্ছি না, আমার স্বামী, সেই যে জয়দেবপুরে ওকে খানেরা খুন করল, আমাকে অত্যাচার করল, কোথায় পালাচ্ছি আমরা, পালালে প্রতিশোধ নেওয়া হবে কি করে? সেই প্রথম থেকে কি যে পালানোর হিড়িক পড়ে গেল দেশটাতে! কেবল যাচ্ছে আর যাচ্ছে। কেবল দেশটা ক্রমে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আর যাচ্ছে।

অরুণ বুঝতে পারল ময়নার চোখ চক চক করছে। অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না। কেবল বোঝা যায় ওর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে। ওর চোখ সেই জলাভূমির উপর, যেখানে মানুষের মিছিল অন্ধকারে উঠে এসে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অরুণ বলল, ময়না, ওরা চলে গেছে। আমরা অনেক পিছনে। দেরি করিস না। দেরী করলে আমাদের বিপদ হবে।

॥ এগারো ॥

সমসের ওদের বিদায় করে কিছুক্ষণ মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। নান্নু মিঞা দাঁড়িয়ে আছে গোলাপজাম গাছটার নিচে। সে সমসেরকে নিয়ে ফিরবে। কিন্তু সমসের মাঠের দিকে সেই যে তাকিয়েছিল, আর পিছনে ফিরে তাকাবার কথা ভাবে নি। কেউ ওর জন্য গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে তাও তার মনে নেই। যেন তার এখানেই দাঁড়িয়ে থাকার কথা, এবং এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ভোর হয়ে যাবে।

নান্নু মিঞা ডাকল, চলেন।

সমসের পেছনে তাকালে দেখল নান্নু মিঞা তেমনি হ্যারিকেন হাতে। চিমনিতে কালি পড়ে গেছে বলে, উপরটা অন্ধকার। হ্যারিকেনের আলোতে নান্নু মিঞার কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাকিটা অস্পষ্ট। সে অস্পষ্ট একজন মানুষের মুখ দেখতে পেল না। সিঁড়ি ধরে নেমে কাছে গেল। এবং কাছে গেলে বুঝল নান্নু মিঞা এখন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবে তাকে। ওদের পাঠিয়ে দিয়েও কোথায় যেন এক অনিশ্চয়তা, এবং চারপাশ থেকে যা খবর আসছে—সব মৃত্যুর খবর, আর সব নিপীড়নের কথা শুনলে সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। এতক্ষণে হয়তো দিলীপ, মিনু আবুলকে নিয়ে অলিপুরার বাজার ডাইনে ফেলে ক্রমে আরও উত্তরে এগিয়ে যাচ্ছে। অলিপুরার বাজারের ওপাশে খানেরা ছাউনি ফেলেছে। ঘাট পারাপার হতে দিচ্ছে না। যদি কাঠের বাক্সটা ধরা পড়ে, কি যে হবে! এবং বুলেটে বিদ্ধ প্রিয় সন্তানের মুখ অথবা ছোট্ট সেই মেয়েটি, কখনও কখনও মিনুর আশ্চর্য কোমল মুখের পীড়নের ছবি মনে হলে সে স্থির থাকতে পারে না। সে মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে

কি সব ভাবছিল। ওর সব, সব বলতে সে যা বোঝে, সব তার এখন নৌকায়। সে এতসব করার পরও কেন জানি স্থির থাকতে পারছে না।

নান্নু মিঞা বলল, কি ভাবছেন?

—কিছু না, চলুন।

কিছুদূর এগিয়ে সমসের বলল, যদি মেহের ওরা ফিরে না আসে, এখানকার সব ভাঁর আপনার থাকবে।

—কি যে কন। আমি পারি?

—নিশ্চয়ই পারবেন।

যেতে যেতে নান্নু মিঞার মুখ সহসা কেমন সুখী মানুষের মত মনে হল।

—এত বড় কাজকর্মে আমার মত মানুষ লাগে জানতাম না।

সমসেরের এত বিনয় ভাল লাগছিল না। সে বলল, মেহের ফিরে এলেও আপনাকে চার্জ বুঝে নিতে হবে। আমি মেহেরকে অন্য জায়গায় পাঠাব।

—কোনখানে?

—সে আছে—।

নান্নু মিঞা জানে সে বেশি কিছু আর প্রশ্ন করতে পারবে না। নিয়ম নেই। পুকুড়ের পাড় ধরে ওরা হেঁটে আসছিল। জল কম, জল কম বললে ভুল হবে, প্রায় নেই, জল ঘোলা এবং গরু-বাছুর স্নান করিয়ে জলের আর কিছু নেই। সেইজন্য ওরা পুকুরে নেমে হাত-মুখ ধুল না, পাশের টিউবওয়েলে হাত-পা ধুল। সমসেরের চোখ জ্বালা করছে বলে মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিল বেশি করে।

ঘরে ঢুকে দেখল সমসের, পরিপাটি করে বিছানা করে রেখেছে নান্নু মিঞার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। জলের গ্লাসে জল রেখেছে। টেবিলের ওপর দুটো বই। এবং নিচে, ঠিক তক্তপোষের নিচে, বদনা, বড় থালা রেকাবিতে পান, এসব দেখে সমসের মনে মনে হাসল। ওরা জানে না,

ওর শুয়ে থাকার সময় আর নেই। নান্নু মিঞা হ্যারিকেনটা একটু নিবু নিবু করে রাখবে কি না ভাবছিল, এবং সমসের শুয়ে পড়লে নিভিয়ে দেবে কি না, অথবা নান্নু মিঞা দাঁড়িয়ে আছে, কতক্ষণে সমসের শোবে, শুয়ে পড়লেই মশারি ফেলে দেবে, গুঁজে দেবে। এমন মানী মানুষ ওর বাড়িতে রাত কাটাচ্ছে, এবং এখানে থেকে যাবে কিছুদিন। অন্ততঃ, এখানকার কমাণ্ড—যতদিন মেহের ফিরে না আসে, সে-ই দেখাশোনা করবে। এই যে রাস্তায় আসতে আসতে বলা, নিশ্চয়ই পারবেন—সবই বুঝি ঠাট্টাছলে। সুতরাং সে কতক্ষণে সমসের শুয়ে পড়বে, এবং শুয়ে পড়লে মশারি গুঁজে দেবে এমন যখন ভাবছিল, তখন সমসের চুপচাপ, এবং দেয়ালে ঘড়ি দেখছে, টিক্ টিক্ ঘড়ির কাঁটা বাজছে. বেজে চলেছে, সে হ্যারিকেনের আলোতে ঘড়ির কাঁটা দেখতে পাচ্ছে না, সে তাড়াতাড়ি উঠে নান্নু মিঞার কাছ থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে একটু ওপরে তুলে ক'টা বাজে দেখল। একটা বেজে গেছে। সে যদি সাইকেলে সোজা পথে অর্থাৎ ভয়ের পথ. ধরে, বিপদের পথ ধরে যায়, তবে বেশি সময় নেবে না। প্রায় ওদের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে পৌঁছে যাবে।

সমসের বলল, বারো নম্বর কুটিরের ফাইলটা দিন।

এত রাতে ফাইল-পত্র নিয়ে বসা, অবশ্য যা সময়, কিছুই থাকছে না. কখন কি হবে কেউ জানে না। সুতরাং নান্নু মিঞা উবু হয়ে বসল। তারপর ভাঙা তোরঙ্গ ঠেলে, একটা কাঠের বাক্স থেকে ছোট ক'টা চিরকুট তুলে বলল, বারো নম্বর দিলাম। দেখেন, ঠিক আছে কি না।

সমসের ছাপ এবং হাতের লেখা দেখে টের পেল, ঠিক আছে। সে তার ওপর খচ খচ করে কি লিখল। তারপর চিরকুট ক'টা ওর হাতে দিয়ে বলল, এখানে যে-ই ফিরে আসবে, তাকে এটা দেখাবেন। এটা দেখালেই ওরা আপনাকে মেনে নেবে। আপনার নির্দেশে কাজ করবে।

নান্নু মিঞা এতটা ভাবে নি। সে এ অঞ্চলে অনেকটা যোগাযোগের কাজ করে যাচ্ছিল। ওর জমি আছে, বাড়িতে গোলা আছে। ছেলেরা বড় হয়েছে। দুই ছেলের সাদি দেবে ভাবছে, সে মান্যগণ্য মানুষ এলে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করে সুখ পায়। সে নিজেও যে একজন মানী মানুষ এমন সৌভাগ্য বয়ে আনার জন্য ভোটের আগে কি না খেটেছে! তারপর ধীরে ধীরে সে কোথায় চলে এল। আগে যে মনে মনে ছিল সে মুসলমান, তাবৎ মুসলমান মানুষ দুনিয়ায় জাত-ভাই, সব তার আপন, এখন সে আর তা ভাবতে পারছে না। এই মাটি অথবা গাছের ফল আর বেতঝোপে যখন বেতফল পেকে থাকে, তখন কেন জানি কোন মরুভূমি সদৃশ অঞ্চলের সঙ্গে একটা সে তফাৎ খুঁজে পায়। এবং সে যখন শহরে যায়, সেই সব সাদা মানুষেরা, সে দেখেছে, ওদেশ থেকে যারাই এসেছে তারাই যেমন লম্বা এবং বলশালী আর চোখ। কটা কখনও, কখনও সাদা রঙ গায়ে, ওদের বড় ঘৃণা করত। সে দুঃখী মানুষের মত মুখ করে গঞ্জ থেকে ফিরে এলে সেই যে কে যেন একটা বাংলা গান গেয়েছিল, গানটা কেবল মনে পড়ে যায়, ছিল ধান গোলা ভরা শ্বেত ইঁদুরে করল সারা—এমন গান মনে এলে সে বুকে বল পায়। সে এখনও বুঝি সেই গান শুনতে শুনতে অসীম এক বলশালী মানুষ হয়ে গেলে, টের পায় সমসের উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে সব দিয়ে বলেছে, আমাকে কিছু কার্তুজ, একটা রাইফেল দিতে হবে। সোজা পথে যাচ্ছি।

সমসের আর কিছু বলল না। বস্তুত সে বলতে চাইল না। সে তার স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তানকে যে ছেড়ে দিয়েছে নেকড়ে বাঘের কবলে, এখন তা টের পেয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। এসব নান্নু মিঞা যাতে টের না পায় সেজন্য সে বলল, মেহেরকে সাহায্য করার জন্য আরও লোকের দরকার। ১৭ নম্বর কুটির থেকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু যা খবর আছে, দু একদিনের ভিতরে এ অঞ্চলে

আক্রমণ ঘটতে পারে। যদি তাড়াতাড়ি আর একটা অঞ্চল গড়ে তুলতে না পারি, তবে আমরা সরে পড়ব কোথাও। কাজ সারা হলে আমি আর মেহের বের হয়ে পড়ব। দন্দি পরাপরদির কাছে আমার মনে হয় আর একটা মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলতে পারব।

নান্নু মিঞা হ্যারিকেন রেখে ভিতর-বাড়িতে ঢুকে গেল। ছোট একটা করমচা গাছ। চৈত্রমাস বলে করমচা গাছের পাতা কম। গাছটা ঝোপের মত, তার নিচ দিয়ে উঠে যেতে হয়। এবং একটা মই লাগালে বেশ উঁচু হয়ে যায় জায়গাটা। সে মই বেয়ে উপরে উঠলে 'কাড়' হাতের নাগালে পেল। এবং সেখান থেকে টেনে বের করল চার নম্বর কুটিরে যে রাইফেল যাবার কথা, তার একটা। বাক্স থেকে কিছু কার্তুজ। সে গুণে গুণে পনেরোটা নিল। পাঁচটা করে তিনবার সমসের লোড করতে পারবে।

সমসের পনেরোটা কার্তুজ নিল না। সে তা থেকে পাঁচটা রেখে দিল। একটা জানের বিনিময়ে একটা কার্তুজ, এমন নির্দেশ আছে। সুতরাং সে ইচ্ছামত কার্তুজ নিতে পারে না। সে কোমরে একটা থলের ভিতর কার্তুজগুলো রেখে দিল। নান্নু মিঞা সাইকেল আনতে গেছে। সে রাইফেলের নল খুলে আলোর মুখে নলটা চোখে রেখে দেখল। ভিতরে ময়লা পড়ে থাকতে পারে। দেখল, না, বেশ সাফ আছে নলটা। এখানে যে ক'ট. রাইফেল আছে, সব দেখা-শোনা করে নান্নু মিঞার ছেলেরা, বৌরা। এবং নিশ্চিন্তে এটা একটা ওদের বড় ঘাঁটি হয়ে গেছে। কোন সন্দেহজনক লোক ঘোরাফেরা করলে ধরে আনা হয়, জিজ্ঞাসাবাদের পর নিশ্চিন্ত হলে ছেড়ে দেওয়া হয়, না হলে ছ'নম্বর কুটিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই কুটির নদীর পাড়ে। ওখানে কি যে হয় নান্নু মিঞা বলতে পারে না।

এভাবে একটা জাতি ভিতরে ভিতরে লড়ছিল। অথবা বলা যায় লড়াই আরম্ভ করে দিয়েছে। ঈশ্বর এবং আকাশ দুই ওদের

কাছে বড় হয়ে নেই। আছে মানুষ। মানুষ বলতে বোঝে ওরা নদী-নালার মানুষ। মাঠ পার হলে যে মসজিদ-মন্দির অথবা গঙ্গা-পদ্মার জল বয়ে যায় তার পাশে থাকে এক বটবৃক্ষ, সেই গাছের নিচে দাঁড়ালে, দেশটাকে খুব বড় মনে হয়।

নাসু মিঞা এই বয়সে কত খাটতে পারে। সে সাইকেল এনে রেখে দিল। সমসের বাইরে এসে দাঁড়ালে সে দেখল সমসেরের কাঁধে রাইফেল, চোখে চশমা। নাসু মিঞা বলল, অন্ধকারে ঠিক পথ চিনা যাইতে পারবেন তো?

—ঠিক যেতে পারব।

—চোখে কম ছাখেন শুনছিলাম।

—চোখে এ সময় কম দেখলে চলবে কি করে! বলে হাসতে হাসতে সাইকেল চালিয়ে অদ্ভুত গতিতে সমসের মিঞা গাছপালার ভিতর অন্ধকারে হারিয়ে গেল

॥ বারো ॥

যাক, বাঁচা গেল। সবাই ছোট মেয়েটাকে নিয়ে এখন কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। কবিরুল বলল, আয় মা, কোলে আয়। এবার আমরা তোর জন্য বেঁচে গেলাম। আমাদের আর ভয় থাকল না।

বেশ বেগে নৌকা ছুটছে। সামনে আর কোন ভয় নেই। চারপাশের যা কিছু গ্রাম মাঠ সব চুপচাপ। মানুষের সাড়া পাওয়া যাবে না। ভয়ে এ-অঞ্চলে মানুষেরা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে দেখে এমন মনে হচ্ছে। নদীর পাড়ে পাড়ে ওরা ভেবেছিল মানুষের মিছিল দেখতে পাবে। রাতে রাতে যারা পালাচ্ছে, তাদের দেখতে পাবে। ওরা কিছুই দেখতে পেল না। কোলে নিয়ে মিনু ওকে আবার ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। আবুলের চোখে ঘুম আসছে না। আর বেশি দেরী নেই। ঘণ্টা দুই লাগবে। খুব বেশি হলে ঘণ্টা তিন। সকাল হতে বাকি থাকবে না। সুতরাং এ-সময়টা পাটাতনে মা-র পাশে চুপচাপ বসে থাকবে ভাবল। ভাবলেই তো হয় না, মনের ভিতর কত কথা এসে যে উঁকি দেয়। আবুল বলল, মা আমাদের কি হবে ?

—তোমাদের কি হবে বাবা, তোমাদের ভাল হবে।

—মুজিবর সাহেব কোথায় আছে মা ?

—কি করে বলব। কিছুই তো জানি না।

মাতিন বলল, আমরা জিতবই আবুল। এই বলে সে মিনুভাবির দিকে তাকাল, এর পর কি করবেন ভাবি ?

—কি আবার করব !

—আমাদের সঙ্গে তো আপনার আর দেখা হবে না।

—কেন হবে না ?

—কোথায় কার ঠিকানা থাকবে কেউ আমরা জানব না।

—নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমরা যেখানেই থাকি বাংলাদেশেই থাকব। দেশে আমাদের ঠিকানা হারিয়ে যেতে পারে না।'

আবুল বলল, আচ্ছা মা, আমরা ধরা পড়লে ওরা আমাদের মেরে ফেলত?

মিনু এমন কথার কি জবাব দেবে। সে ভাবতে পারে না, মানুষ সময়ে সময়ে কত ছোট হয়ে যেতে পারে।

—আচ্ছা মা ওদের মা বোন নেই? আমার মত ছোট ভাই নেই ওদের?

আবুল ছোট। সুতরাং মাঝে মাঝে সে এমন প্রশ্ন করে যে জবাব দিতে অসুবিধা হয়। সে উত্তর না পেলে রেগে যায়। —আমি ওকে জাগিয়ে দেব মা। বলে সে ছোট্ট মেয়েটার চুলে বিলি কেটে দিতে থাকল।

মিনু ধমক দিল, দুষ্টুমি করবে না আবুল।

আবুল এবার বলল, আমার খিদে পেয়েছে মা।

—এই না খেলি?

—আবার খিদে লেগেছে?

—এখন এমন করতে নেই সোনা।

—খিদে লাগলে কি করব!

—সকাল হলে হাসিম সাহেবের বাড়ি উঠে যাব। সেখানে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এটুকু সময় তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

কবিরুল বলল, আবুল ঠিকই বলছে ভাবি, রাত জাগলে খিদে পায়।

সাবির বলল, তোরও খিদা লাগল?

—কি ভাবে নৌকা বাইছি, খিধা লাগব না, বল?

মিনু বলল, আমরা সবাই খেতে পাব। আর বেশি সময় নেই। আমিনুল সব জানে। আমিনুল এখন কি করছে!

আমিনুল সেই যে চুপচাপ বসেছিল আর কথা বলছে না। ওর স্কোয়াডের শেষ সম্বল সে আছে। নদীর জলে দুজন গেল, দিলীপ

গেল গুলিতে। দু-দিনের ভিতর এমন হল। ওর এসব কথাবার্তা ভাল লাগছে না। ওদের এই সংগ্রামে কোথায় যেন বড় একটা ত্রুটি থেকে গেছে। কেবল মার খাচ্ছে, একের পর এক। এখনও কপালে কি আছে বলা যায় না। ছোট্ট মেয়েটা তাদের আশ্চর্য ভাবে রক্ষা করল। খান সৈন্যেরা উঠে এলে সে যদি না কাঁদত, তবে দশটা নৌকার মত এই নৌকাকেও আটকে রাখত তারা। মিনুবৌদির কোলে একজন ছোট্ট মেয়ে দেখে ওরা কেন যে কিছু বলল না। মেয়েটার মুখে টর্চ মেরে ওরা কি যে দেখেছিল কে জানে, ওরা কি বলতে বলতে উঠে গেল। ওদের ভাষা ওরা বুঝতে পারেনি। ফলে এই মেয়ে একমাত্র মেয়ে যে তাদের ত্রাণ করছে, এমন একটা চিন্তা মনে আসতেই ওরা ফের এই বাচ্চাটাকে নিয়ে মেতে গেল। এখন যে ভাবে নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে, একেবারে 'নাইয়র যাওনের' মত। ওরা যেন বেড়াতে যাচ্ছে। যেমন ঈদের পার্বণে ওরা যায়, যেমন পূজা-পার্বণে তারা যায়, তেমনি যাচ্ছে। কোন বাধা নেই। সামনে কোন বিপত্তি নেই। বেশ যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে। আবুল নানারকম কথা বলছে। যার কিছু অর্থ হয়, বাকি কিছু অর্থবিহীন। সাবির কি একটা দুঃখের গান গেয়ে নৌকা বাইছে। ছইয়ের উপর সাইকেল তিনটা। ওদের চাকা ঘুরছে। হাওয়া লাগলে ঘুরে যাচ্ছে। এ-নৌকায় কেবল একজন নেই। সে নেই বলেই একজন, একজন বললে ভুল হবে, মিনু আর আমিনুল চুপচাপ বসে আকাশের নক্ষত্র গুণছে মত। কোথায় যে এর শেষ, ওরা বুঝি ভেবে পাচ্ছে না। যা খবর, বড় বড় সব নেতা মানুষেরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। ওরা চলে গেলে সামান্য শক্তি নিয়ে তারা কি করবে। সব মানুষই খানেদের ভয়ে আবার কেমন বিধর্মী হয়ে যাচ্ছে। যা ছিল না তাদের ভিতর, যা এতদিন ছিল তাদের মোয়া, এখন কে যে কার মোয়া খায়, সব আবার আগের মত, ধর্মের নামে আবার সেই মানুষ ক্ষেপানো। এতদিন ধরে যে নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে, যারা সারা মাস কাল ভুলতে বসেছিল এই দেশ এক

ধর্মের দেশ, ধর্মই এখানে সব, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন দাম নেই, তারাই আবার ধর্মের নামে কেমন ক্ষেপে গেল। এখন এসব ভেবে ওরা চুপচাপ। কথা বলতে পারছে না কেউ। ওরা বুঝে ফেলেছে মনে মনে, ওরা হেরে যাচ্ছে।

—কিছুই শেষ হয়ে যায় না। মিনু আমিনুলকে এমন বলে সামান্য সাড়া পেতে চাইল। আমিনুলের হাতে এখন সব। সে, দিলীপ নেই বলে ভেঙে পড়লে চলবে কি করে!

আমিনুল বলল, কত ছোট তখন, দিলীপের ছোট বয়সের কথা আমিনুল জানে, একবার ফুটবল খেলে দিলীপের পেটে লেগেছিল, আমিনুল আর ওর ক্লাসের ছেলেরা দিলীপকে কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, ভয়, দিলীপ না মরে যায়। ওরা খেলতে গিয়ে এমন ঘটনা ঘটলে, দিলীপের মা অসহায় চোখে হাসপাতালের দরজার সামনে দাড়িয়ে থাকলে আমিনুল কাছে যেতে সাহস পেত না। যেন আমিনুল এবং তার ক্লাসের ছাত্ররা এ-জন্য দায়ী। দিলীপ ওদের হয়ে তিনটে গোল করতে গিয়ে জখম হয়েছে। ক্লাসের সম্মান দিলীপের কাছে নিজের জীবনের চেয়েও বড় ছিল। অথবা ছোট বয়সের আম চুরি করে খাওয়ার কথা। দিলীপ যেতে যেতে অনেক দূর থেকে মাটির ঢিল কুড়িয়ে নিত হাতে। বাগের কাছে এসে মুখ সুবোধ বালকের মত করে রাখত। কেউ যেন টের না পায় মুখ দেখে, দুষ্টু ছেলে আমের ডালে ঢিল ছুঁড়বে। হাতের টিপ বড় বেশি ঠিক ছিল। সে সবার সঙ্গে সব কিছু সব সময় ভাগ করে খেয়েছে। দিলীপের ছোট ছোট কথা মনে হলে আমিনুল খুব দূরে একটা টিট্টিভ পাখির ডাক শুনতে পায়। সে আর তখন স্থির থাকতে পারে না।

মিনু বলল, সাবির তুমি একটা কাজ করবে ভাই?

—কি কাজ?

—তুমি খুকিকে নিয়ে হেঁটে চলে যাও।

হঠাৎ এ-কথা শুনে কবিরুলের কেমন হুঁশ ফিরে এল। সে বলল, ভাবি, ঐক কাজ করলে হয় না?

—কি কাজ ?

—আপনারা হেঁটে চলে যান। আমি মাতিন আমিনুল নৌকাটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। হাসিম সাহেবকে খবর দিন নৌকা আমরা খুব সকালে ঘাটে ভিড়িয়ে দিচ্ছি। লোকজন যেন ঠিক থাকে।

মিনু বলল, আমিনুল কি বলে ছাখো।

কবিরুল বলল, আমিনুল কি বলে ?

—তা যাউক। তবে আমার মনে লয় গিয়া কাম কি। হাঁইটা যাইতে কষ্ট।

তা ঠিক। ছ'ঘণ্টার মত পথ হাঁটতে কষ্ট। যখন নিরিবিলি চলে যাওয়া যাচ্ছে, তবে অনর্থক হেঁটে কি হবে।

কবিরুল বলল, খানেরা আক্রমণ করলে ওদের অসুবিধা হবে।

এটা একটা কথা বটে। একটা বাচ্চা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। ওদের বরং সে নামিয়েই দেবে ভাবল। ওরা হরিহরদির মাঠের নিচে এসে গেছে। যদি বড় মাঠ এবং বাঁশের সাঁকো ভেঙে যেতে হয়, তবে ঘণ্টা ছুইও লাগবে না। আমিনুল ভাবল, সে ওদের, অর্থাৎ আবুল মিনু এবং বাচ্চা মেয়েটাকে, সাবিরের সঙ্গে নামিয়ে দেবে। সে নামিয়ে দেবার আগে সব জেনে নেবার মত বলল, লাধুর চর যাইতে পারবি তো ?

সাবির বলল, এদিকের পথ-ঘাট আমার চেনা আছে।

—তবে ভাল।

আর তখনই পাড়ে দাঁড়িয়ে মাঠ থেকে কে যেন হাঁকল, সজনে ফুল। নৌকা দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট অন্ধকারে নৌকাটাকে দেখে সমসের চিনে ফেলল। সে হাঁকল, সজনে ফুল।

যেমন হয়ে থাকে, কোন শব্দ নেই। নৌকার গতি সহসা থেমে গেছে। কে হাঁকছে, এই অসময়ে কে হাঁকছে! ওরা কেউ কথা বলছে না। কেবল আবুল যেন বুঝতে পারছে, মিনুও বুঝতে পারছে, সেই মানুষ তার এসে গেছে। ওর তো আসার কথা নয়! সে ভেবে পেল

না, কি করে এত সত্বর, অথবা মানুষটা কি জাদু জানে, নাকি পাড়ে পাড়ে মনুষটা সন্ধ্যা-রাত থেকে পাহারা দিয়ে দিয়ে আসছে! আমিনুল প্রথম কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে আছে। মিনু, আবুল পরিচিত গলায় ডাক শুনেও কথা বলতে পারছে না। সাড়া দেবার অধিকার আমিনুলের। আমিনুলই সাড়া দেবে। বলবে, তালপাতার পাখা। কিন্তু আমিনুল কোন সাড়া দিচ্ছে না বলে ওরাও চুপ করে আছে।

আবার পাড় থেকে সেই হাঁক। সজনে ফুল, তালপাতার পাখা।

মিনু ভাবল, আমিনুল এখনও অন্যমনস্ক। সে বলল, শুনতে পাচ্ছ?

আমিনুল পাটাতনে বসে ভাবছিল, সমসের ভাই কেন আবার! কোন কি দুর্ঘটনা আবার কোথাও ঘটেছে? সে কি যে করবে! ওর নানারকম চিন্তা ভাবনা, সে তাড়াতাড়ি হাঁক দিতে ভুলে গেছে। সে উঠে দাঁড়াল পাটাতনে। তারপর মুখে দুহাত রেখে হাঁক দিল, সজনে ফুল, তিন নম্বর কুটির, তালপাতার পাখা। কি অসীম দরাজ গলা, আর উচ্চস্বরে সেই শব্দ, ওপারে এক প্রাচীন হিন্দু জমিদারের পোড়ো বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে বার বার প্রতিধ্বনি তুলে যাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে আদিগন্ত মাঠ জুড়ে সেই সবল এবং স্বাধীনতার ডাক আগুনের মত উজ্জ্বল বহ্নিশিখা তৈরি করছে। সেখানে যত পাপ এবং ভীরুতা আছে সব যেন এবার আগুনে পুড়ে মরবে।

সমসের বলল, পাড়ে নৌকা ভিড়াও।

অস্পষ্ট অন্ধকারে নৌকাটা পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। সমসের সাইকেলের প্যাডেলে পা তুলে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। সে খুব সন্তর্পণে লক্ষ্য রাখছে সব। কেমন যেন একটা অনুভূতির সঙ্গে সব কিছু মিশে গেছে—নতুবা এত দূর থেকেও সে চিনতে পারত না, এই নৌকাতেই মিনু, আবুল, দিলীপ আছে। তার ভিতর থেকে একটা আশ্চর্য অনুভূতি এ-ভাবে কাজ করলে, সে একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল।

ও খুব উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। পাড় খাড়া। খাড়া পাড়ে সে চার

পাশটা দেখতে পাচ্ছে। বাঁ দিকে বড় অশ্বত্থ গাছটার ডাল পালা একটা ছাতার মত আকাশ ঢেকে রেখেছে। কিছু জোনাকি পোকা জ্বলছে ঝোপে জঙ্গলে। পাশে শ্মশান। এখন এ-অঞ্চলে হিন্দু গ্রাম প্রায় নেই বলে, এখানে বোধ হয় আর চিতা জ্বলে না। তবু মনে হয় পুরানো ভাঙ্গা মঠের ভিতর কোন সন্ন্যাসীর ডেরা আছে। যেখানে নানা রকম বিশ্বাসের খেলা। সমসের চারপাশটা লক্ষ্য করতে গিয়ে ভাবল, সে এখন কি যে করে! যা খবর তাঁতে সবাই ভেঙ্গে পড়ছে। অথচ সে জানে মানুষের এই ইচ্ছা কত কালের। স্বাধীনতার ইচ্ছা। এবং চার পাশের গাছপালার মতো ওটা নিরন্তর বাড়ছে। ওটা সে জানে কোনদিন মরে যেতে পারে না। এবং যা কিছু সাহস সে এখনও প্রাণে রেখেছে, সব এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর।

নৌকাটা পাড়ের কাছে এলে সমসের সাইকেল-টা প্রথম একটা গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর সে ধীরে ধীরে ভাঙ্গা সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে যেতে থাকল। ওরা সজনে ফুল, তিন নম্বর পাতায় কুটির বললেও, একটা ভয় যে না আছে, কত লোক ছদ্মবেশে, গলা নকল করে তাকে ধরবার তালে থাকতে পারে—সে হাতের মুঠোয় ছোট্ট কালো জীবটাকে শক্ত করে ধরে রাখল। এবং কাছে গেলে যখন মনে হল যথার্থ ই মিনু বসে রয়েছে, আবুল এক লাফে নিচে নেমে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে তখন সে কেমন সহজ হয়ে গেল।

গলুইতে মিনু, আমিনুল ও-পাশে। কবিরুল, মাতিন, আমিনুল বৈঠা লগি সব ঠিক ঠাক করে রাখছে। এবং নৌকা ঘাটে বেঁধে ফেলার জন্য খুব দ্রুত কাজ করছে। কেবল সে দিলীপকে দেখতে পেল না। মিনুও কিছু বলছে না। এমন কি ওকে দেখে এতটুকু আশ্চর্য হচ্ছে না যেন। সমসের ভিতরে ভিতরে ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, মিনু তোমাকে তাড়াতাড়ি নামতে হবে। আবুল এখন বিরক্ত করবে না। আমিনুল, দিলীপকে কোথায় পাঠিয়েছিস?

আবুল বলল, চাচা মরে গেছে।

সমসেরের বুকটা কেঁপে উঠল।

আমিনুল বলল, দিলীপ আমাদের নৌকা থেকে নামিয়ে দিল।

মিনু বলল বাকিটা। সে বলল, কাঁধের এ-পাশটায় গুলি লেগেছে। এবং সে বলতে থাকলে সমসের কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নতুন একটা ফ্রণ্ট খেলার জন্য সে মনে মনে যা ভেবে রেখেছিল, অর্থাৎ ওর ইচ্ছা ছিল সেই ফ্রণ্টে দিলীপের ওপর থাকবে কমাণ্ডের ভার—এখন এই মাত্র এ-সব ঘটনায় তা কেমন নিরর্থক মনে হচ্ছে।

মিনু সমসেরের কপালে হাত রেখে দেখল তখন, ওর গায়ে জ্বরটা কেমন আছে। সমসের বলল, মিনু আমরা যেখানে যাচ্ছি, যাবার কথা, তোমরা এত দূর যে জন্য এলে এখন সব গোলমাল হয়ে গেছে। সমসের ঠিক মতো যেন কথাগুলো এখন গুছিয়ে বলতে পারছে না পর্যন্ত। সে মিনুকে ফিরে পেয়ে আবুলকে কাছে পেয়ে কেমন সব গোলমাল করে ফেলছে। অথচ এমন এক সময়, এ-সময়ে মানুষের নিজস্ব কিছু থাকে না। দিলীপের মৃত্যুতে সমসেরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সমসের ভাবল, মৃত্যুর কি কোন দাম নেই! মৃত্যু কি কোন শপথের কথা বলে না! মৃত্যু মানুষকে, মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহাকে আরও বড় করে দেয়। কেন যে এ-সময় তার এত ভাল ভাল কথা মনে পড়ছে! মিনু এখন সেই শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। কবিরুল, মাতিন, আমিনুল আরও কিছু শুনতে চায়। কাঠের বাক্সটা পাটাতনের নিচে। সমসের আর কিছু বলছে না। কেমন চুপচাপ থেকে নিশীথের মানুষ হয়ে গেছে।

ওরা পরস্পর কেউ আর কথা বলতে পারছে না। ওরা এখন কেবল কিছু শুনতে চাইছে। কিভাবে ওরা পরবর্তী এক্সান শুরু করবে। সমসেরের এমন একটা ছবি দেখতে ওদের ভাল লাগছে না। ওরা এখন কোথায় যাবে, কারণ সমসেরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায়, ওরই ওপর সব কিছু নির্ভর করছে।

অথচ সমসের কিছু বলছে না। যেন বলতে তার কষ্ট হচ্ছে।

অমির্ম্মল বলল, কোন খারাপ খবর আছে ?

সমসের বলল, দিলীপকে তোরা কোথায় রেখে এলি ?

—আঁলিপুরার কাছে।

—পানিতে ফেলে দিলি।

—কি আর করব !

—ভাল করেছিস !

—ওর খুব ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিনে সে একটা বড় আমলকি গাছের নিচে বসে থাকবে। সমসের কাঁপা কাঁপা গলায় কথাগুলি বলল।

ওরা কেউ জবাবে কিছু বলছে না ! যেন এখন সমসেরই বলবে, ওরা শুনবে। ওদের কাজ কেবল শোনা।

সে বলল, দিলীপ বলত, স্বাধীনতার দিনে শহরে সবাই যখন কুচকাওয়াজ দেখতে যাবে, আমি সেদিন একটা সাইকেলে নিরিবিলি নদীর পাড়ে নেমে যাব। কোন গাছের ছায়ায় বসে, পাখির ডাক শুনব, ফুল ফুটতে দেখব। আমি পাখির ডাক শুনলে, ফুল ফুটতে দেখলে ঠিক বাংলাদেশের মানেটা বুঝে ফেলতে পারি।

সমসের একে একে সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে যাচ্ছে। দিলীপ সম্পর্কে সব কথাবার্তা। কবে দিলীপ যেন বলেছিল, স্বাধীনতার দিনে, তোমরা আমাকে কিছুতেই বড় বড় সভায় নিয়ে যেতে পারবে না।

সমসের বলত, তা সেদিন তুই জনতার সামনে কিছু বলবি না !

—কি বলব।

—আমরা কি-ভাবে মুক্তি সংগ্রামে নেমে পড়েছিলাম। আমাদের বীরত্বের কাহিনী।

—ওটা আবার বীরত্বের কি আছে রে ! জননীর জন্য শাকপাতা তুলে আনাকে সংগ্রাম বলে না। সংগ্রাম হচ্ছে পরে, দেশকে গঠন করবার ভিতর রয়েছে সংগ্রাম। আমরা ছুটো খান সেনা মেরে

দেশ স্বাধীন করে ফেললাম এর আর দাম কি। দেশের মানুষ ওদের না চাইলে ওরা থাকবে কি করে! বেহায়া কিছু থাকে। তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে না দিলে যেতে চায় না। আমরা মা জননীর হয়ে সেই ধাকাটা কেবল দিয়েছি। বাপু তোমরা এতে বীরত্বের কি ত্থাখো বুঝি না।

সমসের বলল, দিলীপ ছিল সাধাসিধা মানুষ। তোরা তো মাসিমাকে দেখিস নি। আমি বলেছি, মাসিমা, আপনাদের সবাইতো ও-পারে চলে গেল, আপনি গেলেন না, ছেলেপুলে নিয়ে থেকে গেলেন! সমসের এই বলে একটু চুপ করে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, মাসিমা আশ্চর্য একটা কথা বলেছিলেন। দেশের মাটিতে তোমার মেসোমশাই রয়েছেন। তাঁকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব! আমার দেশ মাটি যা কিছু ঐ মানুষটার সঙ্গে মিশে আছে। দিলীপকে বলেছিলাম চলে যেতে। সে এমন বললে, হাসে। আমি কি করব বল!

সমসেরের ভিতর একটা আশ্চর্য সাহস আবার দানা বেঁধে উঠছে, যেন দীলিপ ওর মাঝে রয়েছে। আমরা তো পাশেই আছি সমসের। দিলীপ এমন বলছে।

সমসের দেখতে পেল, চারপাশের তরুলতা নিঝুম। ওরা চারপাশে তাকে ঘিরে আছে। সে পর পর কি বলে যাচ্ছে ওরা মন দিয়ে শুনছে। সমসেরই পরবর্তী নির্দেশ দেবে। এবং সেজন্য ওরা কোন কথা বলতে পারছে না।

সমসের বুঝতে পারল, মাথার উপর নিরিবিলি আকাশ এবং অজস্র নক্ষত্র তারা এখন দেখতে পাচ্ছে। এটা বাংলা দেশের মাটি, কুয়াশা সামান্য পড়েছে হয় তো। ঘাসগুলি ভিজা ভিজা। সে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সব ঘাস ফুল ফল তার এত চেনা যে সে কিছুতেই আর কোন নৈরাশ্যের কথা ভাবতে পারছে না। দিলীপ মরে গিয়ে যেন ওদের এগিয়ে যাবার কথা বলছে, এবং যেন ওরা দেখতে পাবে,

এ-ভাবে গোটা দেশটা একটা মুক্তি যুদ্ধের সৈন্যবাহিনী হয়ে গেছে। সে বলল, দিলীপ আর আমাদের ভিতর নেই। একটু থামল। বলতে তার কষ্ট হচ্ছে, দিলীপ আর আমাদের ভিতর নেই। ওর গলা কেমন বুজে আসছে। সে কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল, সে আমাদের ভিতর না থাকলেও সব সময় ভাবব, সে আমাদের ভিতর আছে। শুধু দিলীপ কেন, যারা যারা আমাদের এক এক করে চলে যাচ্ছে তারা সবাই আছে। যে কোন ফ্রণ্টে যখন লড়ব মনে রাখব আমরা একা লডছি না। আমাদের সঙ্গে ওরা আছে বলেই বুঝতে পারব, মাটিতে মানুষের ছায়া অজস্র। এক এক করে এই অজস্র ছায়া আমাদের পাশে দাঁড়াবে। কারণ একমাত্র মাটি কখনও বেইমানি করে না। এত রক্তপাত আমাদের বিফলে যাবে না। মাটি মা, আম্মা অথবা জননী বলতে পার তিনি সব রক্তপাতের চিহ্ন বুকের ভিতর ধারণ করছেন। সমসের এই পর্যন্ত বলে মিনুর মুখ দেখার চেষ্টা করল। বলল, মিনু তোমার সন্তান আবুলকে আমাদের দিতে হবে।

মিনু ঠিক বুঝতে পারছে না, সমসের কি বলতে চায়।

সমসের বলল, হাসিম ধরা পড়েছে। কি করে যে খবর চলে গেছে খানেদের কাছে, একটা বাক্স আসছে হাসিম সাহেবের বাড়িতে। একসানের সব প্ল্যান এবং প্রোগ্রাম ওদের হাতে পড়ে গেছে। চরম বিশ্বাসঘাতকতা! কে যে করল! গ্রামের কে যে এতবড় দুশমনি করল!

শেষে সমসের বলল, আমাদের এখন আত্মগোপনের পালা। বলেই সে ফের তাকাল মিনুর দিকে। কিন্তু মিনুর চোখে মুখে কোন ভীতির ছাপ আছে কিনা অন্ধকারে বুঝতে পারল না।

সমসের ফের বলল, মিনু তোমাকে এই বাচ্চাটা নিয়ে সরে পড়তে হবে। কাল তোমাকে নানু মিঞার কাছে চলে যেতে হবে। ও-খানে আমাদের সেবা শুশ্রুষার জন্য লোকের দরকার। আবুল থাকবে আমাদের সঙ্গে। আমাদের নতুন ফ্রণ্ট খোলার জন্য আবুলকে নানাভাবে দরকার হবে।

আমিনুল বলল, আপনি কি করে জানলেন ?

—একুশ নম্বর কুটিরে খবর নিলাম, ময়না ওরা ঠিকমতো পথ চিনে যেতে পেরেছে কি না ? তখনই ওরা খবর দিল, গ্রামটা খান সৈন্যে ছেয়ে আছে। সেখানে খানেদের নতুন ছাউনি পড়েছে। ওরা যেতে পারে নি।

আমিনুল বলল, কাকে কাকে পাঠিয়েছিলেন ?

—অরুণ, মেহের, আবেদালি, ময়না।

—এখন ওরা কোথায় ?

—ওরা মজুমপুরে আছে।

—এখন তবে কি করবেন ?

—এখন আমাদের নতুন ফ্রন্ট গড়তে হবে।

মাতিন বলল, আমাদের এখন ধরা পড়ার পালা।

সমসের সামান্য রুষ্ট হল। সে বলল, এ-সময় এমন বলতে নেই।

মাতিন বলল, আমি ঠিকই বলছি সমসের ভাই, আমাদের শুধু ধরা পড়ার ভয়। ধরা পড়লেই দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি। বলে কেমন দুঃখের হাসি হাসল মাতিন।

সমসের এবার মাতিনের কাঁধে হাত রাখল। বলল, ধরা পড়ব কেন ? এন্‌কাউন্টার হবে। আমরা সব সময় ঘাসের ভিতর মুখ লুকিয়ে বন্দুকের নল উঁচু করে রাখব মাতিন। কেউ আমাদের আর হারাতে পারবে না। তুমি এই গাছপালা মাটি মানুষের ইচ্ছার কথাটা শুনতে পাচ্ছ না। আমরা কখনও হারতে পারি ! তারপর সে কি ভেবে বলল, বাজারের দিকেই আর একটা কুটির বানিয়ে ফেলতে হবে। এ অঞ্চলের এমন কে আছে যাকে বিশ্বাস করা চলে !

আমিনুল একটু ভেবে বলল, ও-পারের রায় মশাইরা যদি থাকে।

—থাকবে না কেন ? কবিরুল প্রশ্ন করল।

—গ্রাম ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে। ওরাও চলে যেতে পারে বর্ডারের দিকে।

সমসের, মিনু, সাবির, মাতিন কবিকুল একটা গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এমন সব কথা ফিস্ ফিস্ করে বলছে।

সমসের বলল, এখন আপাতত মজুমপুরেই আমরা যাব।

আমিনুল বলল, নান্ত মিঞার কুটিরে ফিরে গেলে হয় না?

সে কাল হবে। তুমি মিনুকে নিয়ে চলে যাবে। আমার সঙ্গে থাকবে আবুল। আবুলকে আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তাছাড়া আমরা এক সঙ্গে আর ফিরে যেতে পারি না। সব কট ওদের জানা হয়ে গেছে। আমাদের সব কুটিরগুলোর খবর পেয়ে গেছে ওরা। নতুন নতুন কুটির তৈরি করতে না পারলে আমাদের আর রক্ষা নেই। আমরা জানি আমাদের কুটিরগুলো ওরা গুঁড়িয়ে দেবে, এরোপ্লেন থেকে যেমন ঢাকায় ওরা বম্বিং করেছে, এখানেও ঠিক এমনি করবে। আমাদের এখন শুধু তৈরি হওয়া। ওরা একটা নষ্ট করবে, আমরা দশটা নতুন তৈরী করব। যত ওরা ভাঙবে তত আমরা মরিয়া হয়ে উঠব। আমাদের এ লড়াই দীর্ঘদিনের। সমসের ভাঙা গলায় কথা বলতে গিয়ে উপরের দিকে তাকাল। কিছু জেট প্লেন উড়ে যাচ্ছে। সে বলল, দেখছ, কেমন মহড়া দিচ্ছে! সকাল হলে এ-অঞ্চলটা কি যে হবে! সকাল হবার আগে আমাদের সবাইকে মজুমপুরে যেতে হবে। বরং আমিনুল তুই এক কাজ কর, বলে সে কি ভাবল কিছুক্ষণ। বস্তুত এমন একটা সময় সে কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। হাসিম ভাইয়ের আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল। কে কুটিরের সব খবর যে পৌঁছে দিয়েছে! সবটাই রহস্য মনে হয়। সে আর ভাবতে পারছে না। তবু এ-সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। সে তারপর বলল, তুই আর সাবির নৌকা ঠেলে মজুমপুরে নিয়ে আয়। আমরা হেঁটে চলে যাচ্ছি।

আবুল বলল, বাবা, আমি ওদের সঙ্গে নৌকায় যাব?

—তোর নৌকায় গিয়ে কি হবে ?

মিনু বলল, তুমি বরং আমাদের সঙ্গে এস।

আবুল কেমন দুঃখী মানুষের মত মুখ করে রাখল। বলল, পায়ে আমার লাগছে। হাঁটতে পারছি না। পায়ে ফোসকা।

মিনু জানে ওরা অনেকখানি রাস্তা হেঁটেছে চষা জমির ওপর দিয়ে। সে সমসেরকে বলল, আবুল নৌকাতেই থাক।

—তবে যা।

কবিরুল বলল, আয় আমি তোকে কাঁধে নিচ্ছি।

সমসের বলল, কি দরকার কতটুকু আর পথ। ওরা নৌকায় গেলে হয়তো আমাদের আগে চলে যাবে।

এখন দুটো দল দুভাগে যাচ্ছে। ক্লান্ত অবসন্ন ভগ্নপ্রায় মিছিলের মত ওরা অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছে।

চারপাশটা কি অন্ধকার! তবু নির্মল আকাশে অজস্র নক্ষত্র। চারপাশটা ফাঁকা, মাঠে চষা সব জমি। এব পাশে নদীর জল, রূপোলি রেখার মতো। অন্ধকার অস্পষ্ট মাঠে ওরা দীর্ঘ যাত্রায় এসময় বের হয়ে পড়েছে। কবে ওরা বড় মাঠ পার হয়ে নির্দিষ্ট কুটিরে পৌঁছে যাবে জানে না।

এ-ভাবে তারপর চারিদিকে গাছপালা পাখির ভিতর, শুধু দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার। গাছপালার ভিতর দিয়ে মায়ের জন্য ওরা ফের নতুন কুটির নির্মাণের ব্যবস্থা করছে। ওদের রাইফেলের বেয়নেটগুলো অন্ধকারেও চক চক করছিল। কি মহিমময় আকাশ, আর নক্ষত্র। দূরে হয়তো কোন গাছের নিচে ময়না এখন পোশাক পাল্টে নিচ্ছে। গাছের উপর উঠে গেছে হামিদ। সে ডালে, শাখা-প্রশাখায় বৃহন্নলার মত সব তূণ তুলে রাখছে। সময় এলেই সে-সব সে নামিয়ে দেবে।

ওরা তখনও হাঁটছিল। আশায় আশায় হাঁটছিল। ওরা এ-ভাবে আশায় আশায় হাঁটবে। ওরা এ-ভাবে হাঁটতে হাঁটতে একদিন ঠিক নদী পার হয়ে যাবে।